কাকাহিগড় অভিযান

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়





উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির * কলিকাতা-৭০০০০৭

KAKAHIGAR AVIJHAN
by Shastipada Chattapadhyo
Rs. 10·00
Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market.
Calcutta-7000007 (1st floor)

প্রথম প্রকাশ :
জৈষ্ঠ্য, ১৩৯৩
মে, ১৯৮৬

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭ (দ্বিতলে)

মুদ্রাকর :
বি. এন. শীল
ইম্প্রেসন-কন্‌সালট্যান্ট
৩২/ই জয়মিত্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৫

প্রচ্ছদ চিত্র :
নারায়ণ দেবনাথ

অলংকরণ :
দিলীপ দাস

পরিকল্পনা :
দিব্যদ্যুতি পাল

দশ টাকা

বন্ধুবর

ডঃ নীরদ হাজরাকে

—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়



অবশেষে অনেক জল্পনা-কল্পনার পর দেওঘরেই যাবার ঠিক হ'ল। চন্দনের খুসির আর অন্ত নেই তাই। পুরী অনেকবার গেছে। দীঘাও ফাঁক পেলেই যাওয়া হয়। রাজগীর খুবই ভালো জায়গা। বেনারসও বার পাঁচেক যাওয়া হ'ল। অথচ দেওঘর কত কাছে। কিন্তু যাচ্ছি-যাবো করে যাওয়া আর হয় না। ওর ছোট মাসী দেওঘরে বিলাসী টাউনে থাকেন। অনেকবার যেতে বলে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু বাবা না গেলে?

চন্দন একাও যেতে পারে। আজকালকার দিনে পনেরো বছর বয়সের একটি ছেলে সুযোগ পেলে দুনিয়া চষে ফেলতে পারে। কিন্তু এমনই এক পরিবারে মানুষ হচ্ছে চন্দন যে ওর মা-বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামান্য দক্ষিণেশ্বরেও বেড়াতে যাবার উপায় নেই ওর। চন্দন ওর স্কুলের লাইব্রেরী থেকে পাণ্ডব গোয়েন্দার অভিযান মূলক বইগুলো এনে পড়ে। মা-বাবা, কাকা-কাকিমা, জেঠুমণি সবাই পড়েন। চন্দন বলে—ঐ সব একরত্তি ছেলে মেয়েগুলো যদি দেশ-দেশান্তরে গিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে আসতে পারে, তাহলে আমি একলা কোথাও বেড়াতে যেতে পারব না কেন?

বাবা সুনন্দ চৌধুরী অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক। বলেন—ও সব গল্পের বইতেই সম্ভব। বাস্তবে নয়। বুঝলি? যত্তো সব গাঁজাখুরি লেখা। তবে পড়তে কিন্তু ভালো লাগে।

মা বলেন—সে তুমি যাই বলো, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মতো ছেলে মেয়ে হয় না। আর ওদের ঐ কুকুর পঞ্চু…।

সুনন্দবাবু হোঃ হোঃ করে হাসিতে ফেটে পড়েন।

চন্দন বলে—বাবা, তোমরা আমাকে কাছ ছাড়া করতে চাও না

জানি। কিন্তু জেনে রেখো আমি স্কুলে প্রথম ছেড়ে দ্বিতীয় হইনি কখনো। সামনের বছর ফাইন্যাল দেবো। সেখানে কি হবো তা জানি না। তবে এটুকু জেনে রেখো আমার মন কল্পনার জগতে ওড়ে। আমি ঘাটশিলার ফুলডুংরি পাহাড়ে উঠে পূর্ণিমার রাতে চাঁদের জ্যোৎস্না গায়ে মাখতে চাই। আমি বেলপাহাড়ির ডাকবাংলোয় বসে অরণ্যের শোভা দেখে চোখ জুড়োতে চাই। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, ঝর্ণা-জলপ্রপাত এই সব দেখতে আমি খুব ভালোবাসি। কিন্তু তোমরা যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে সময় পেলেই ঐ সব জায়গায় ঘুরতে তাহলে কত খুসি হতাম। তোমাদের শুধু পুরী, বেনারস আর দীঘায় পেয়েছে। একবার কিরকম ভুল করে রাজগীর চলে গিয়েছিলে। তোমরা মধুপুর গেছ অথচ দেওঘর যাওনি। দেওঘরে গেলে থাকার অসুবিধে নেই। ছোট মাসী তো প্রায়ই চিঠি লেখেন। এবার হয় সবাই মিলে চলো, নয়তো আমাকে যেতে দাও। আমি ঘরকুনো একটা জড়ভরত হয়ে থাকতে চাই না। আমি চাই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মতো ছেলে হতে।

সুনন্দবাবু কেন্দ্রীয় সরকারের একজন পদস্থ অফিসার। অত্যন্ত দাম্ভিক লোক তিনি। আর দারুণ কড়া মেজাজের মানুষ। দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ের রঙ ফর্সা। যেমন-তেমন ফর্সা নয়, একেবারে ধপধপে ফর্সা। সবসময় একটা লাল আভা ফুটে বেরোয় গা থেকে। ঘন-ঘন চুরুট খান। চায়ের বদলে কফি। চন্দনের কথা শুনে হেসে বলেন —উঁহু। ও তুমি যাই বলো, একা যাওয়া তোমার হচ্ছে না।

স্ত্রী দেবযানীও যেন সাক্ষাৎ দুর্গা প্রতিমাটি।

আর চন্দন? শুভ্র সুন্দর স্বাস্থ্যবান এক কিশোর। বড়-বড় ভাসা ভাসা চোখ দু'টো ভ্রমরের মতো। মাথায় ঘন চুল। লাল টুক টুকে গায়ের রঙ। যেন সোনা কুঁদে তৈরী। স্কুলে পড়াশোনার ফাঁকে-ফাঁকে এনতার গল্পের বই পড়ে। আর কল্পনায় দেশ-দেশান্তর ঘুরে-বেড়াবার স্বপ্ন দেখে। কেউ কোথাও থেকে ঘুরে এলে ও অবাক দু'টি চোখে তার ভ্রমণের বৃত্তান্ত শোনে। শুনতে-শুনতে ওর মনও সেই শোনার মাঝে হারিয়ে যায়।

বাবার কথা শুনে চন্দন বলে—বেশ, একা আমি কখনো যাবো না। একা গেলে আমারও কষ্ট হবে বৈকি খুব। তোমাকে, মাকে ছেড়ে আমি কখনো কোথাও থাকিনি তো। তবে দেওঘরে যাবার সখ আমার বহুদিনের। তোমরা আমাকে একবার দেওঘরে নিয়ে চলো। যদি যাও ভালো। না গেলে কিন্তু…।

—পালাবে। এই তো? বলে সুনন্দবাবু একটু হেসে বললেন—আসলে ব্যাপার কি জানিস, কোথাও গিয়ে কারো বাড়িতে থাকাটা আমার ঠিক পোষায় না। মনে হয় যেন সব সময় পরাধীন। দীঘা পুরী যেখানেই যাই সেখানেই আমি হলিডে হোম পাই। কেমন স্বাধীন ভাবে ঘুরিফিরি। কিন্তু দেওঘরে গেলে তো সেটা পারব না। তোর ছোট মাসী দুঃখ করবে তাহলে। অতএব ওখানে গেলে সেই পরের বাড়িতেই উঠতে হবে।

দেবযানী বললেন—পরের বাড়ি বলছ কেন? আমার বোন। সে যদি তোমার পর হয় তো আপনার জনটা কে শুনি? বেশ, তুমি না যাও না যাবে। চন্দনকে নিয়ে তাহলে এ বছর আমিই যাবো দেওঘরে। তুমি তোমার হলিডে হোম খুঁজে যেখানে হোক চলে যেও।

চন্দন আনন্দে লাফিয়ে উঠল—হু-র র্ র্-রে।

এমন সময় হঠাৎই একদিন ছোট মাসীর চিঠি এলো। এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ নিয়ে। মাত্র কয়েকদিন আগে ওদের বাড়িতে এক বড় ধরণের ডাকাতি হয়েছে। তাই.ত ওরা প্রাণে বাঁচলেও ওদের একজন সাঁওতাল মুনিষকে ডাকাতদলের পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হয়েছে। সেই ডাকাতিতে ওর ছোট মাসীর সমস্ত গয়নাগাটি, সিন্দুকের টাকা পয়সা এবং তার চেয়েও বড় জিনিস ওদের সাতপুরুষের প্রতিষ্ঠা করা অষ্টধাতুর রাধাকৃষ্ণ মূর্তিটি খোয়া গেছে। ঐ মূর্তির বর্তমান মূল্য প্রায় লাখ টাকা। ওরা এই ব্যাপারে যথারীতি থানা পুলিশ করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। চারিদিক তোলপাড় করেও পুলিশ সন্ধান পায়নি সেই অষ্টধাতু বিগ্রহর। ছোট মাসীর অনুরোধ এই দুঃসময়ে ওরা যেন একবার এসে ওদের পাশে দাঁড়ায়। কেননা ওর শ্বাশুড়ি ব্লাড

প্রেসারের রুগী। তিনি শয্যাশায়ী। এবং স্বামী নিরুপম মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থর মতো হয়ে গেছে।

এই চিঠির পর আর না যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। দীঘা, পুরী, রাজগীর সব কিছু নাকচ করে সুনন্দবাবু দেওঘর যাওয়াই ঠিক করলেন।

দেওঘরে যাবার ঠিক তো হ'ল। কিন্তু যাওয়াটা হবে কি ভাবে সেই নিয়ে জোর আলোচনা বসল। ছোট মাসীর চিঠি শুধু যে এ বাড়িতেই এসেছিল তা নয়, দেবযানীর বাপের বাড়িতেও গিয়েছিল। দেবযানীর দুই ভাই, অর্থাৎ চন্দনের দুই মামা বীরেন ও ভাস্কর ছুটে এলো তাই। বীরেন বলল—রূপার চিঠি পেয়েছিস বড়দি ?

রূপা হ'ল ছোট মাসীর নাম।

বীরেন বলল—আমার তো জানিস যাওয়ার কত অসুবিধে। তাই ভাবছি ভাস্করটাই যাক। তোরা যদি যাস তো খুবই ভাল হয়। রূপার চিঠি পড়ে যা বুঝলাম, তাতে মনে হচ্ছে ওখানকার পুলিশ ঠিক গা করছে না। শুধুই লোকদেখানো তল্লাসী চালাচ্ছে। নাহলে এত বড় ডাকাতি, একটা খুন, অথচ একজনও অ্যারেস্ট হ'ল না ?

সুনন্দবাবু বললেন—আমরা তো যাচ্ছি। দেখি না ওখানকার ব্যাপার-স্যাপার কিরকম। নাহলে দরকার হলে কলকাতা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ নিয়ে গিয়ে তদন্ত করাব।

বীরেন বলল—চিঠি পড়ে জানা যাচ্ছে এটা মাত্র দিন পনেরোর ব্যাপার। কিন্তু ঐ রকম একটি মাল হাপিস করার পক্ষে পনেরোটা দিন বড় কম নয়। এই পনেরো দিনে অষ্টধাতুর রাধাকৃষ্ণমূর্তি হয়তো এখন সিঙ্গাপুরে পৌঁছে গেছে। সে মাল কি এখনো ধারে কাছে আছে ভেবেছেন ? পুলিশও প্রাথমিক তদন্ত করে কিছু না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কাজেই অযথা এক কাঁড়ি টাকা পয়সার শ্রাদ্ধ করে ওসব গোয়েন্দা পুলিশ করতে যেও না তোমরা।

দেবযানী বললেন—বাঃ! তাহলে ঐ লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি একদল ডাকাত এসে লুটে নিয়ে যাবে, আর আমরা তা চুপ চাপ মেনে নিয়ে তাদের ধরবার চেষ্টা না করে বসে বসে কপাল চাপড়াবো। এ কি

রকম কথা ?

বীরেন বলল—ওঃ বড়দি, তোদের বোঝাতে পারব না। কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তির চেয়ে কয়েকটা জীবন খুব বড় নয় কি ? তোরা তো গেলি না কখনো দেওঘরে। গেলে বুঝতিস কি ভয়ঙ্কর নির্জনে ওরা থাকে। অত টাকা কড়ি গয়না গাটি, ঐ রকম একটা দুষ্প্রাপ্য বিগ্রহ নিয়ে বাস করতে গেলে কয়েক ব্যাটেলিয়ান মিলিটারী সব-সময় বাড়ির দোর গোড়ায় রাখতে হয়। নাহলে যে কোন মুহূর্তে জীবন তো বিপন্ন হবেই। ওরা যে বাড়িশুদ্ধ লোককে প্রাণে মারেনি এই ঢের। সাঁওতাল মুনিষটা বোকার মতো প্রভুভক্তি দেখাতে গিয়েই মরেছে। ঐ অবস্থায় সশস্ত্র কিছু ডাকাত দলের পিছু নিতে আছে কখনো ?

সুনন্দবাবু বললেন—এটা অবশ্য একটা যুক্তি পূর্ণ কথা, আর আমারও মনে হয় এই ধরণের বহুমূল্য কোন জিনিস ব্যক্তিগত জিম্মায় না রেখে সরকারের হাতেই তুলে দেওয়া উচিৎ।

দেবযানী রেগে বললেন—কি যে আবোল-তাবোল কথা বলছো তোমরা। সন্ন্যাসীর দেওয়া প্রতিষ্ঠা করা গৃহদেবতা কাউকে দিতে আছে নাকি ?

বীরেন বলল—না দেওয়ার ফলটা দেখতে পেলি তো ? যখন যেমন যুগ তখন তেমন ব্যবস্থা নিতে হবে। তুই নিজে তোর গায়ের গয়না-গুলো ব্যাঙ্কের লকারে রেখেছিস কেন বল ? কেন কোথাও বেড়াতে গেলে ওগুলো পরে যাস না ? কেন মাসে-মাসে গোছা-গোছা টাকা ঘরের সুটকেশে না রেখে ব্যাঙ্কে দিয়ে আসিস ?

দেবযানী আর কোন কথা না বলে গজ-গজ করতে লাগলেন।

সুনন্দবাবু বললেন—তবে হ্যাঁ, এই চুরি-ডাকাতি একেবারে যেমন মেনে নেওয়া যায় না, তেমনি ওদের দিক থেকে কিন্তু ভালো হয়েছে। আর কেউ কিছুর লোভেই ওদের বাড়ি চড়াও হতে আসবে না। ঐ রকম পরিবেশে নিঃস্ব হয়ে থাকাটাই শান্তির থাকা।

বীরেন বলল—যাক। এখন ওসব কথা বাদ দাও। তোমরা কি তাহলে যাচ্ছো ?

সুনন্দবাবু বললেন—হ্যাঁ যাচ্ছি।

—রূপা খুব খুসি হবে তাহলে, কিন্তু কি ভাবে কোন গাড়িতে যাবে ঠিক করেছ কিছু?

ভাস্কর মামা বলল—জামাইবাবু, আমি বলছিলাম কি দেওঘরে যাওয়ার পক্ষে তুফানই বেস্ট ট্রেন। সকাল দশটা দশে হাওড়া থেকে ছাড়ে। বিকেল তিন, সাড়ে তিনটে নাগাদ জসিডিতে পৌঁছে দেয়। ওখান থেকে বাস, টাঙ্গা, অটো যা মন চায় তাই নেবে। চাই কি ট্রেনেও যেতে পারো। লাগোয়া ট্রেনও আছে।

দেবযানী বললেন—সবই তো শুনলাম। কিন্তু তুফানে উঠবে কি করে? ঐ হিন্দুস্থানীদের ভীড়ে মারামারি করে গরু-ছাগলের মতো বোঝাই হতে আমি কিন্তু রাজি নই।

বীরেন বলল—তাহ'লে বম্বে জনতায় যা।

সুনন্দবাবু সঙ্গে সঙ্গে টাইম টেব্‌ল খুলে গাড়ির সময়টা দেখে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ, এটাও ভালো গাড়ি। আর এ গাড়িটা একেবারে ফাঁকা যায় শুনেছি। আগে সপ্তাহে তিন দিন ছিল। সোম, বুধ, শুক্র। এখন তো দেখছি এটা বাই উইক্‌লি হয়ে গেছে। বুধ আর শুক্র। তা চলো সপ্তমীর দিন বেরিয়ে পড়া যাক।

ভাস্কর মামা বলল—আমার কোন আপত্তি নেই। গোছ গাছ করে ফেল তাহলে।

চন্দন এতক্ষণ চুপ করে সকলের কথা শুনছিল। এবার বলল—তোমরা বেশ তো। সপ্তমীর দিন কোন দুঃখে যাবো। আমাদের এত বড় একটা জাতীয় উৎসব। এই সময় কখনো দুর্গা প্রতিমার মুখ না দেখে ট্রেন জার্নি করে কেউ? পূজোর কদিন আমি কলকাতা ছাড়ছি না। এই সময় গেলে আমারও কিন্তু খুব মন খারাপ হয়ে যাবে।

সুনন্দবাবু বললেন—এই তো নয়। দেওঘরে যাবার জন্যে এতদিন কি কান্নাকাটি। আর যেই যাবার ঠিক হ'ল অমনি আজ নয় কাল।

চন্দন বলল—তুমিই বলো না বাবা। পূজোর কদিন কি কোথাও যেতে মন চায়? সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ঘুরে ঠাকুর

দেখব। চুটিয়ে খাবো। দশমীর দিন গুরুজনদের পায়ের ধুলো মাথায় নেবো। তারপর একাদশীর দিন যাওয়া।

ভাস্কর মামা বলল—তাহ'লে তো বম্বে-জনতা পাবো না। সেই তুফানেই যেতে হবে।

দেবযানী বললেন—কি যে তোমরা তুফান-তুফান করো। কেন রাত্তিরে কি কোন গাড়ি নেই? রিজার্ভেশান করে নিশ্চিন্তে চলো। কোন থ্রি-টায়ার পাও কিনা দেখো।

সুনন্দবাবু বললেন—রাতের গাড়িতে থ্রি-টায়ারে গেলে আরাম পাওয়া যায় বটে তবে কি জানো, ঠিক সকাল বেলায় তো পৌঁছয় না। শেষ রাতে নামিয়ে দেয় সব।

—সেই রকমই একটা গাড়ি দেখো যেটা হাওড়া থেকে সবার শেষে ছাড়ে আর জসিডিতে ভোরবেলা পৌঁছয়।

ভাস্কর মামা বলল—রেলের ব্যাপার স্যাপারগুলোই যেন আলাদা। এদিকে দেখুন গিরিডির জন্যে কি চমৎকার দিল্লী এক্সপ্রেসে একটা প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর থ্রি-টায়ার বগী লাগিয়ে দেয়। বগীটা মধুপুরে কেটে রেখে দিল্লী এক্সপ্রেস চলে যায়। তারপর গিরিডির লোক্যাল সেই কাটা বগী জুড়ে নিয়ে ভোরবেলা পৌঁছে দেয় গিরিডিতে। সেই রকম কোন একটা ট্রেনেও যদি দেওঘরের ঐ রকম একটা থ্রি-টায়ার বগী লাগিয়ে দিত তাহলে কি ভালোই না হোত। মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে যদিও বা একটা বৈদ্যনাথ ধামের বগী দেয় তাও সেটা সাধারণ বগী। থ্রি-টায়ার নয়। কাজেই সেই ভিড়ের গুঁতোগুঁতি। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে বসে যাওয়া যাবে না। অথচ দেওঘরের ট্যুরিস্ট কি কম? গিরিডির চেয়েও হাজার গুণ বেশি।

সুনন্দবাবু বললেন—আমার মনে হয় এই ব্যাপারে রেলের নিশ্চয়ই কোন মাইলেজের ব্যাপার আছে। নাহলে দিচ্ছে নাই বা কেন?

দেবযানী বললেন—ওসব কথা থাক। এখন যাবার একটা উপায় করো। মোট কথা রাতের গাড়িতেই যাবো আমি।

চন্দন বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভালো। রাতের গাড়িতেই যাবো

আমরা, রাতের গাড়িতে যেতে আমার খুব ভালো লাগে। যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়।

ভাস্কর মামা বলল—দিদি তোর এ ছেলেটা কিন্তু কবি হবে দেখিস।

সুনন্দবাবু মানি ব্যাগ থেকে এক গোছা নোট বার করে ভাস্কর মামার হাতে দিয়ে বললেন—তবে তাই হোক। যাও, গিয়ে চারটে বার্থ রিজার্ভ করে এসো। যে গাড়িতে পাও।

চন্দন বলল—আমি যাবো বাবা, ভাস্কর মামার সঙ্গে?

—যাও। তবে সাবধানে পথ ঘাট চলবে। মামার হাত ধরে থাকবে সব সময়। বোকার মতো হাঁ করে তাকাবে না কারো দিকে। বুঝলে?

চন্দন 'আচ্ছা' বলে ভাস্কর মামার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ওর মন আনন্দে ভরে উঠেছে।





কলকাতা। কথায় বলে এ এক বিচিত্র শহর। সত্যিই তাই। রূপে রসে গন্ধে আর বৈচিত্রে অনুপম এই শহরের জুড়ি মেলা ভার। সারা ভারতে এমন ব্যস্ত শহর আর কি কোথাও আছে? চন্দনের অন্তত তাই মনে হ'ল। ভাস্কর মামার সঙ্গে ফেয়ারলি প্লেসে রেলের বুকিং কাউন্টারের কাছে আসতেই ও দেখল নানা জাতের নানা ভাষার নানান রঙের মানুষ টিকিটের জন্যে মারামারি করছে সেখানে। চন্দন বলল—এরা সব এখানে কি করছে মামা?

—ওরা সবাই টিকিট কাটতে এসেছে।

—সেকি। এত লোক টিকিট কাটতে চায়? তবে যে শুনি লোকে টিকিট কাটে না!

ভাস্কর মামা বলল—আমি খেয়ে যদি বলি খাইনি তো কার কি বলার আছে? তাছাড়া মিথ্যে কথা বলতে তো ট্যাক্সো লাগে না। ওটা হচ্ছে ভাড়া বাড়ানোর একটা অজুহাত।

—ও।

—তবে সবাই যে টিকিট কাটে এমন নয়। কিছু-কিছু লোক তো আছেই যারা সব সময় ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে। বিশেষ করে লোক্যাল ট্রেন গুলোয় চেকিং-এর ব্যবস্থা ভালো থাকে না বলে চ্যাংড়া ছেলেপুলের দল অথবা গরীব-দুঃখী লোকেরা ভাড়া বাঁচানোর সুযোগ নিয়েই থাকে। তবে ধরা যখন পড়ে তখন মোটা টাকা ফাইন দেয়, নয়তো জেল খেটে প্রায়শ্চিত্ত করে। দুশো লোক যদি বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপে সেখানে তিরিশ জন ধরা পড়লেও সাতশো জনের ভাড়া দিতে বাধ্য হয়। কাজেই বিনা টিকিটের যাত্রীরা বরং রেলের আয়ের একটা উৎস বলতে পারিস। সেইজন্যে ইচ্ছে করেই রেল কর্তৃপক্ষ চেকিং ব্যবস্থা জোরদার

না করে সাধারণ যাত্রীদের বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপার প্রবণতা বাড়িয়ে দেন এবং লক্ষ লক্ষ লোক টিকিট কাটা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে কয়েকটা বিনা টিকিটের যাত্রী ধরে 'লোকসান হচ্ছে' 'লোকসান হচ্ছে' করে চেঁচিয়ে বছর বছর ভাড়া বাড়ান।

চন্দন বলল—তবে যে খবরের কাগজে লেখে রেলের ঘাটতি মেটাতে ভাড়া বাড়ে।

—সেটাও আর এক কারণ বৈকি। রেলের সম্পদ চুরি যে হারে বেড়ে চলেছে, তাতে সারা ভারতবর্ষের লোক যদি মাত্র একটি স্টেশন যাবার জন্যে একশো টাকা ভাড়া দিয়েও টিকিট কাটে তবুও আমার মনে হয় রেল একদিন উঠে যাবে।

—সেকি!

—হ্যাঁ।

—এই চুরি কারা করে মামা?

—সর্ষের ভেতর যে সব ভূতেরা বাস করে তারাই।

—এর কি কোন ওষুধ নেই?

—কেন থাকবে না? এর পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ রূপে কোন বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আসলে আমাদের দেশের সরকার অত্যন্ত ভদ্র বলেই আস্কারা পেয়ে এরা এত মাথায় উঠেছে।

যাই হোক, ভাস্কর মামা চন্দনকে একপাশে দাঁড় করিয়ে নিজে টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়াতেই কয়েকজন লোক এসে ছেঁকে ধরল ওদের। একজন জিজ্ঞেস করল —কোথায় যাবেন দাদা?

—মিনিম্যাকাও।

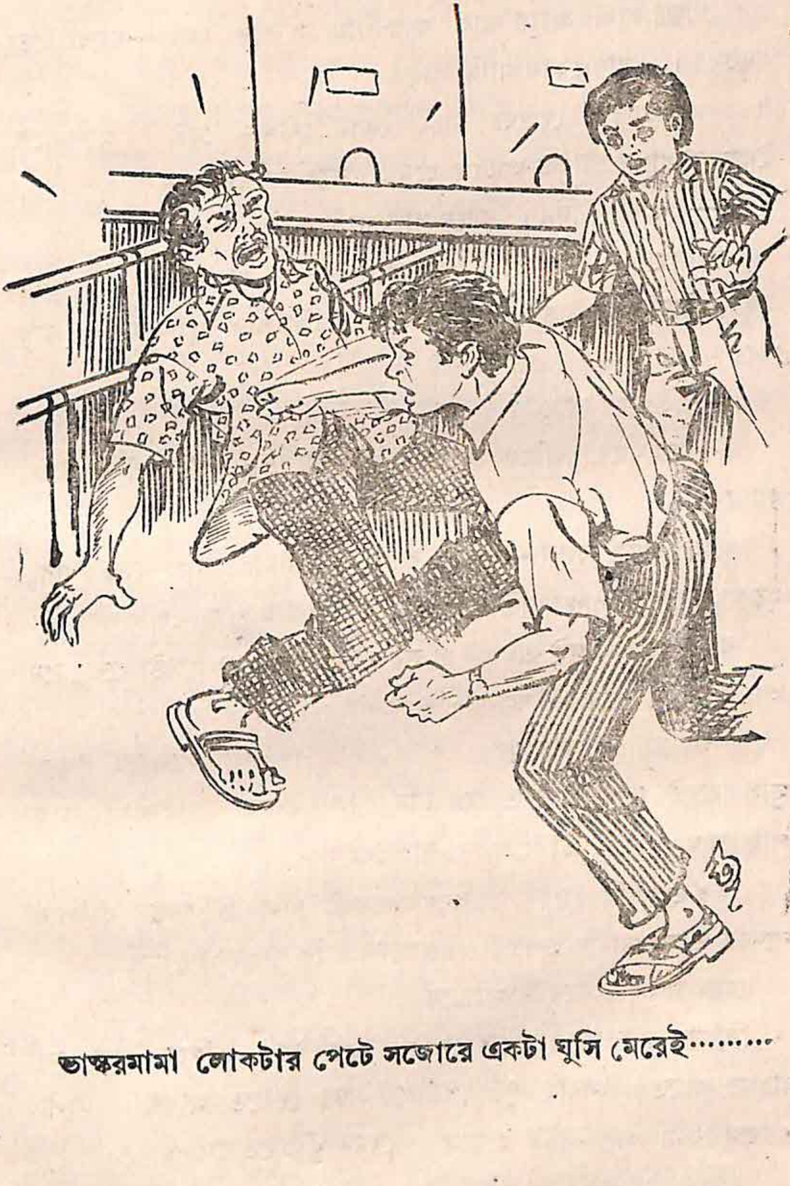
—সে আবার কোথায়?

—ইম্‌বুম্‌পিপে জানো?

—না।

—হিক্কাহিয়াও?

—না।



ভাস্করমামা লোকটার পেটে সজোরে একটা ঘুসি মেরেই·········

—তাহলে ফুটে পড়ো।

লোকগুলো একটু সরে গেল। তারপর তাদেরই ভেতর থেকে আবার দু'একজন এগিয়ে এসে বলল—বলুন না দাদা কোন গাড়ি, কোথায় যাবেন?

ভাস্কর মামা এবার আর ফাজলামি না করে বলল—যাবো তো দেওঘর। দেখি কোন গাড়ি পাই।

—দেওঘর। দেওঘর নামে কোন স্টেশন নেই। আপনাকে বৈদ্যনাথ ধামের টিকিট কাটতে হবে। কবে যাবেন বলুন?

—একাদশীর দিন। মানে সাত তারিখে।

লোকগুলো হোঃ হোঃ করে হেসে বলল—সাতাশ তারিখ পর্যন্ত কোন ট্রেনে একটু বসবার জায়গাও নেই তো সাত তারিখে কি করে করে যাবেন দাদা? কটা টিকিট?

—এই ধরুণ চারটে।

—হয়ে যাবে, বেরিয়ে আসুন। টিকিট পিছু এক্সট্রা পঁচিশ টাকা লাগবে।

ভাস্কর মামা বলল—আমার কাছে পকেটমারা টাকা নেই বাবা, বুঝলে? ওসব ধান্দাবাজি এখানে না করে কেটে পড়ো দেখি সব।

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই একজন ভাস্কর মামার জামার কলারটা ধরে টেনে আনল লাইন থেকে। বলল—কি বললি?

ভাস্কর মামাও জেদি খুব। হঠাৎ লোকটার পেটে সজোরে একটা ঘুসি মেরেই চন্দনের হাত ধরে টান দিল—চন্দন। কুইক্। কেটে পড়ি আয়। আর টিকিটের দরকার নেই।

কিন্তু হলে কি হয়। ততক্ষণে ওদেরই দলের দু'তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভাস্কর মামার ওপর। একজনের হাতে ধারালো ছুরি।

চন্দন চিৎকার করে উঠল ভয়ে।

বিচিত্র কলকাতা। এত লোক, কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না সাহায্য করতে। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। উল্টে একজন কিনা বলল—ঠিক হয়েছে। যেমন ঘাঁটাতে যায় এদের।

কিন্তু কেউ এগিয়ে না এলেও চন্দনের মাথায় তখন পাণ্ডব গোয়েন্দা চেপে গেছে। সে নিজেই হঠাৎ এক দুর্জয় সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ছুরি ধরা লোকটার ওপর। তারপর যে হাতে লোকটা ছুরি ধরেছিল সেই হাতটা ধরে এমনভাবে পাকিয়ে দিল যে চিৎকার করে উঠল লোকটা। ততক্ষণে কয়েকজন আর. পি, এফ. মানে রেলের পুলিশ ছুটে এসেছে। তাদের একজন চন্দনের গালে একটা থাপ্পর কষিয়ে বলল—এই তুম কাহে কো ঝামেলা লাগা দিয়া। হঠো হিঁয়াসে।

ভাস্কর মামা বলল—বাঃ রে। ওর দোষটা কোথায়? ঐ লোকটা যে আমাকে ছুরি মারতে এসেছিল তার বেলা?

আর একজন আর. পি. এফ. এসে ভাস্কর মামার ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল—যাও হঠো। ভাগো হিঁয়াসে।

হাতে মোচড় খাওয়া লোকটার দলের লোকেরা তখন হাসতে-হাসতে চলে গেল সেখান থেকে।

এদের এত হাসির কারণটা যে কি চন্দন তা বুঝতে পারল না প্রথমে। পরে যখন রাস্তায় এসে পকেটে হাত দিয়েই শিউরে উঠল ভাস্কর মামা 'যাঃ সর্বনাশ হয়ে গেছে', তখনই সব পরিস্কার হয়ে গেল!

চন্দন বলল—কত টাকা ছিল মামা?

—সে অনেক টাকা। কিন্তু তোর বাবার কাছে কি করে মুখ দেখাবো রে? আমি একটা বেকার ছেলে।

চন্দন বলল—তবু শুনি না কত টাকা?

—তোর বাবা আমাকে চারশো টাকা দিয়েছিল।

—তাতে কি হয়েছে? আমি বাবাকে সব বলব। যাক চারশো টাকা। তবু তুমি তো প্রাণে বেঁচেছ।

—তুই কিন্তু বাঁচিয়েছিস আমাকে। যেভাবে হাতটাকে তুই পাকিয়ে দিয়েছিস তাতে ঐ হাতে আর কোনদিনও হয়তো ছুরি ধরতে হবে না ওকে। তুই না আটকালে ও ছুরিটা আমার পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিত।

চন্দন শিউরে উঠে বলল—ওঃ! কি সর্বনাশ যে হোত তাহলে।

জানো মামা, পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু না এই রকম সাহসী। আচমকা ভয় না পেয়ে সেটা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে। প্রতিরোধ করে। বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে না। আমিও বাবলুর মতো ছেলে হবার স্বপ্ন দেখি। মৃত্যু তো একদিন হবেই। তাই মরবো বীরের মতোই মরবো। কাপুরুষের মতো কেন?

চন্দনের বড় মামা ডালহৌসী পাড়াতেই একটি অফিসে কাজ করতেন। ওরা সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বলতেই ভাস্কর মামাকে খুব বকাবকি করলেন বড় মামা। তারপর কিছু নিজের কাছ থেকে কিছু সহকর্মীদের কাছ থেকে চেয়ে ভাড়ার টাকার হিসেব করে শ'দুই টাকা দিয়ে দিলেন।

সেই টাকা নিয়ে ওরা আর ফেয়ারলিতে নয়, সোজা চলে গেল অন্য একটি সিটি বুকিং-এ। এখানে আবার অন্য ছবি। ভীড় প্রায় নেই বললেই হয়।

যাই হোক, একটা ফর্মে সব কিছু লিখে চন্দনকে লাইনে দাঁড় করিয়ে ভাস্কর মামা এনকোয়্যারিতে কি যেন জিজ্ঞেস করতে গেল। একটু পরেই ঘুরে এসে ফর্মে ট্রেনের নম্বরটা বসিয়ে দিয়ে বলল—একটা খুব ভালো গাড়ির সন্ধান পেয়ে গেছিরে। ১০৫ আপ নর্থ বিহার এক্সপ্রেস। গাড়িটা নতুন। সপ্তাহে একদিন মাত্র ছাড়ে। রাত এগারোটায়। হাওড়া থেকে।

—তাহলে নিশ্চয়ই গাড়িটা দেরী করে পৌঁছবে। অর্থাৎ আমরা রাতের অন্ধকারে নয়। সকালেই নামতে পারব।

—সেই রকমই তো আশা করছি।

দু'একজন লোকের পরই ভাস্কর মামা কাউন্টারে পৌঁছতে পারল। কাউন্টারে পৌঁছেই ফর্মটা এবং দুটো একশো টাকার নোট বুকিং ক্লার্কের হাতে ধরিয়ে দিল মামা।

বুকিং ক্লার্ক ভদ্রলোক চার্টটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন—আপনি যে গাড়ি চাইছেন ওটা তো সাত তারিখে নেই। ওটা আছে আট তারিখে। শুক্রবার। তাও তিনটের বেশি বার্থ হয় না।

—কেন হয় না ?

—কেন আবার, কোটা নেই।

চন্দন আর ভাস্কর মামা মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল।

ভদ্রলোক বললেন—শুনুন এক কাজ করুন। আমি এখানে তিনটে বার্থ দিয়ে দিচ্ছি। বাকি একটা বার্থ বরং অন্য কোথাও থেকে করিয়ে নিন।

ভাস্কর মামা বলল—বেশ ঠিক আছে। তাই দিন।

ভদ্রলোক ফর্মটা ফেরৎ দিয়ে বললেন—তারিখটা বসিয়ে দিন তাহলে। আর যে নামটা কাটা যাবে সেটাও কেটে দিন।

ভাস্কর মামা তো আনন্দে ডগ মগ। ঘ্যাঁচ করে আগে নিজের নামটাই কেটে দিয়ে তারিখটা আট তারিখ করে ফর্মটা আবার জমা দিল। বুকিং-ক্লার্ক ভদ্রলোক প্রশান্ত বদনে খুব যত্নের সঙ্গে তিনখানি টিকিট নাম-টাম লিখে ফেরৎ দিয়ে সিগারেট খেতে-খেতে তাঁর এক সহকর্মীর সঙ্গে গল্প করতে চলে গেলেন।

ভাস্কর মামা বলল—কি হ'ল মশাই, আমার ব্যালেন্সটা ?

ভদ্রলোক যেন শুনতেই পেলেন না। ভাস্কর মামা চেঁচাতে লাগল —ও মশাই শুনছেন ? এই যে, এই যে দাদা আমার ব্যালেন্সটা ?

ভদ্রলোক এবার এগিয়ে এসে বললেন—কেন আপনাকে ফেরৎ দিই নি ?

—না।

এবার নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এবং বিরক্তিভরে বললেন—কত টাকা দিয়েছিলেন যেন ?

—দু'শো টাকা।

—একশো টাকার দু'টা নোট দিয়েছিলেন না ?

—হ্যাঁ।

—কেন যে আপনারা ভাঙিয়ে দেন না। এখন ভাঙানী কোথায় পাই বলুন তো ? সব পঞ্চাশ, একশো টাকার নোট। বলে হাতড়ে হুতড়ে যা ফেরৎ দেবার কথা তার চেয়ে দশ টাকা কম দিলেন।

ভাস্কর মামা বলল—আর দশ টাকা ?

—আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই! আপনাদের কাজ করে আমরা কিছু পেয়ে থাকি। পূজোর সময় সামান্য দশটা টাকা দিতে পারছেন না ?

ভাস্কর মামা বলল—কোথায় পাবো দাদা ? বেকার ছেলে! আমাকে দশটা টাকা ফেরৎ দিন। আপনাকে বরং একটা টাকা দিচ্ছি চা খাবেন। বলে একটা টাকা কাউন্টারে গলিয়ে দিতেই একটা দশ টাকার নোট হাতে এলো। টিকিট ও টাকা পকেটে নিয়ে কাউন্টার থেকে সরে আসতেই চন্দন বলল—আচ্ছা মামা, এটা তো ঘুষ দেওয়া হ'ল তাই না ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এক টাকা কেউ ঘুষ খায় ?

—কেন খাবে না ? যাক গে একটা টাকা। তিন তিনটে টিকিট তো পেয়ে গেলাম।

—তবু তোমারটা তো হ'ল না।

—না হোক। ও আমি অন্য কোথাও থেকে ম্যানেজ করে নেবো। অনেক বুকিং অফিস আছে। না হয় বিনা রিজার্ভেশনেই চলে যাবো।

কথা বলতে-বলতে ওরা রাস্তায় বেরিয়ে এলো। চন্দন বলল—আচ্ছা মামা, ঐ লোকটা তো কেমন ভালো জামা-প্যান্ট পরে আছে। চোখে চশমা। কি রকম ভদ্রলোকের মতো দেখতে। সামান্য ঐ একটা টাকা নিতে ওর প্রেস্টিজে বাধল না ?

ভাস্কর মামা দুঃখ করে বলল—নারে। আমাদের দেশে দারিদ্রতাটা এখন এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁচেছে, যেখানে পাবলিকের কাছ থেকে টাকা পয়সা খাবার সুযোগ পেলে কেউই ছেড়ে দেয় না। ঐ যে লোকটাকে দেখলি ও মোটা টাকা মাইনে পায়, বোনাস পায়, সপরিবারে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াবার পাস পায়। তবুও ওর স্বভাব।

—তবে মামা, আমি কিন্তু ও রকম হবো না। আমি যদি কখনো বড় হয়ে চাকরি করি তো জেনে রেখো ভগবানের দিব্যি আমি কখনো ঘুস খাবো না।

—চন্দন তুই ভালো ছেলে হ। আমি জানি তুই জীবনে অনেক উন্নতি করবি। অবুও জেনে রাখ ঐ যে ভদ্রলোক নির্লজ্জের মতো একটা টাকা ঘুস খেল। হয়তো ওর সাত-আটটি ছেলে-মেয়ে। হয়তো তারা যখন তখন অসুখে ভোগে। হয়তো ওর ঘরে বুড়ো মা-বাবা আছে। এবং দু'তিনটি আইবুড়ো বোনের বিয়ে দিয়ে হবে। হয়তো ওর স্ত্রীর কোন বড় ধরণের অপারেশন হয়েছে। তাই ঐ বাইরের চেহারায় ভদ্রলোকের খোলসটাই রয়েছে ওর, কিন্তু ভেতরের ভদ্রসন্তান অনেক আগেই মরে গেছে।

—তার মানে তুমি এটাকে সমর্থন করছ মামা? তবে জেনে রেখো আমি কখনো ঐ অবস্থায় পড়লে ঘুষ খাবো না ফলিডল খাবো।

—তা তুই পারিস চন্দন। তবে সবাই কি তুই? রামকৃষ্ণও নরদেহ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন পেশাদার খুনিরাও এসেছিল। সবাই কি এক? রাস্তার মাইল পোস্টটাও পাথর আবার কাশীর বিশ্বনাথও পাথর। তফাৎ আছে বৈকি। তবে ঐ একটি লোককে দেখেই তুই সকলের বিচার করিস না। কিছু সৎ লোক নিশ্চয়ই আছেন, নাহ'লে দেশটা যেটুকু চলছে এটুকুও চলত না।

ওরা কথা বলতে-বলতে কলেজ স্ট্রীটের দিকে এগোল।

ভাস্কর মামা বলল—তুই কখনো কফি হাউসে গেছিস?

—না মামা। কার সঙ্গে যাবো?

—চল তোকে নিয়ে কফি হাউসে যাই।

চন্দনের আনন্দের আর শেষ নেই। এমন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো ওর জীবনে এই প্রথম।





অবশেষে বহু প্রতিক্ষিত সেই যাবার দিনটি এগিয়ে এলো। চন্দনের আনন্দের আর অবধি নেই। ইতিমধ্যে লুকিয়ে সে বাজার থেকে একটা বড় ছোরা কিনে এনেছে। একটা লোক রাস্তার ধারে বসে ছুরি কাঁচি এবং অন্যান্য জিনিসপত্তর বিক্রী করছিল। চন্দন তার কাছ থেকেই কিনল ছোরাটা এবং সেটা নিজের কাছে সযত্নে লুকিয়ে রাখল। কাউকে বলল না কথাটা। সঙ্গে রাখল একটা হুকে বাঁধা নাইলনের দড়ি। কোথায় কি কাজে লাগে তা কে জানে? পাণ্ডব গোয়েন্দারা এইগুলো সব সময় কাছে রাখে বলেই অনেক ক্ষেত্রে বাধা-বিঘ্নকে জয় করে ফেলে। পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলুর হাতে অবশ্য পিস্তল থাকে। ওর তো সে সব কিছু নেই। তবে বিপদকালে একটি ছোরার শক্তিও বড় কম নয়।

যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে রাত এগারোটার অনেক আগেই ওরা স্টেশনে এসে পৌঁছলো। সুনন্দবাবু বলেন, আজকাল রাত দশটায় ট্রেণ ধরতে গেলে কলকাতার লোকেদের বিকেল চারটেয় ঘর থেকে বেরনো উচিত। কিন্তু একথা তিনি মুখে বললেও নিজের বেলায় তা করে উঠতে পারেন নি। যাচ্ছি-যাবো করেও তাঁরা ঘর থেকে বেরোলেন রাত আটটায়। ভবানীপুর থেকে হাওড়া আসতে সময় লাগল পাক্কা দু'ঘন্টা আজ দ্বাদশী হলেও প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভা যাত্রা ছিল অনেক। গতকাল বৃহস্পতিবার থাকায় আজই ঠাকুর বিসর্জনের হিড়িক যেন বেশি করে লেগে গেছে। কিন্তু ট্রেনে ওঠার মুখেই সে এক দারুণ ঝামেলা। কেননা কোন চার্টেই নাম ছিল না ওদের।

সুনন্দবাবু তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন—এরকম তো

সাধারণতঃ হয় না। তারিখ ভুল হয়নি তো ?

ভাস্কর মামা বলল—না। তারিখ, ট্রেণ-নম্বর সবই তো ঠিক আছে।

দেবযানী বলল—আর দরকার নেই আমাদের দেওঘর গিয়ে। চলো ফিরে যাই। খুব হয়েছে। এত নাম রয়েছে অথচ আমাদের নেই ?

অবশেষে দু'একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাদেরই একজন খুঁজে পেতে বার করলেন নামগুলো। আসলে একটু এদিক ওদিক হয়ে গিয়েছিল।

সুনন্দবাবু টিকিট নম্বর মিলিয়ে দেখে বললেন—হ্যাঁ, এই তো। তাই তো বলি এমন তো কখনো হয় না।

ভাস্কর মামার টিকিটটা অন্য বুকিং অফিস থেকে করা হয়েছিল বলে বগীটা আলাদা হয়েছিল। অবশ্য চার্টে নাম খুঁজতে কোন অসুবিধে হয়নি। যাই হোক। এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সকলে।

চন্দনের বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল এতক্ষণ। তীরে এসে তরী ডুববে নাকিরে বাবা ?

কিন্তু না। শেষ পর্যন্ত সব দিক রক্ষা হ'ল। ওরা ট্রেণের কম্পার্টমেণ্টে ঢুকে বার্থে বসে জানালার শার্সিটা তুলে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ভাস্কর মামার বার্থটা অন্য কোচে পড়ায় চন্দনের মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। এমন চমৎকার রাত ভ্রমণে একসঙ্গে এসেও ভাস্কর মামার অন্যত্র থাকাটা ঠিক যেন মেনে নেওয়া যায় না।

ভাস্কর মামা প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়েই বলল—একটা রাত তো। তাও সারা রাত নয়। শেষ রাতে মানে ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই আমরা নেমে পড়ব জসিডিতে। ওর জন্যে মন খারাপ করিস না চন্দন।

সুনন্দবাবু বললেন—আচ্ছা দাঁড়াও। দেখি একবার আমাদের অ্যাটেনডেন্টকে বলে কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। বলে সহাস্য বদনে এগিয়ে গেলেন অ্যাটেনডেন্ট ভদ্রলোকের কাছে। ভদ্রলোক বাঙালি। কি সাম রায় যেন। সুনন্দবাবু তাঁকে সব কথা খুলে বলতেই উনি বললেন, না-না। কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া ওনারও যখন থ্রী-টায়ারে রিজার্ভেশান রয়েছে, তখন অসুবিধা কোথায় ? এমনিতেই

দশ বারোটা বার্থ ফাঁকা আছে। ওনাকে ঐ এগারো নম্বর সাইড লোয়ারে চলে যেতে বলুন।

হু-র্-র্-র্-রে্। চন্দন প্রায় আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

ভাস্কর মামাও উঠে পড়ল ওই টেণে।

যাক। ভাস্কর মামাকে তাহ'লে আলাদা থাকতে হচ্ছে না। অর্থাৎ চন্দন সব সময়ই ভাস্কর মামাকে কাছে পাবে। ওঃ কি মজা। সেই স্বপ্নের দেওঘর। সেই ত্রিকূটের চূড়া। নন্দন পাহাড়। তপোবন। এসবের কত গল্পই না শুনেছে এতকাল। এখন স্বচোক্ষে সব দেখবে। আর সেই দেখার সময় ওর পাশে থাকবে তার অতি প্রিয় ভাস্কর মামা। সত্যি, ভাস্কর মামাকে যে কি ভালো লাগে ওর, তা কাউকে বলে বোঝাতে পারবে না। এত ভালো কাউকে লাগে না। ঠিক যেন বন্ধুর মতো। ভাস্কর মামা সঙ্গে থাকলে কোন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিশতেও ইচ্ছে করে না ওর। হঠাৎ মা হু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন, জয় বাবা বৈদ্যনাথ।

—কি হ'ল মা?

—ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছে বাবা। তাই বৈদ্যনাথের উদ্দেশে একটা প্রণাম করলাম।

ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছে! আরে সত্যিই তো! এই তো। এই তো চলেছে ধীরে শ্লথ গতিতে। একটু-একটু করে আলো ঝলমল জনমানবহীন স্টেশনের প্লাটফরমের সামানা পেরিয়ে ট্রেণ এখন লিলুয়ামুখো। এ ট্রেণ অবশ্য লিলুয়ায় থামবে না। থামবে একেবারে বর্ধমানে।

চন্দনরা বাড়িতে অল্প-স্বল্প খেয়ে এসেছিল। এখন আর একটু জলযোগ সেরে নিল। বড়-বড় লাড্ডু আর ক্ষীর কদম টপা টপ গালে ফেলে ঢক-ঢক করে জল খেয়ে নিল সবাই।

ভাস্কর মামা লাড্ডু খেতে খেতে বলল—ট্রেণ জার্নিতে সব চেয়ে আমোদের ব্যাপার হলো এই খাওয়াটা। আর খেতে গেলেই মনে পড়ে যায় সামন্তদার মেয়ে সোনার কথা। কি দারুণ মিষ্টিখোর ঐটুকু মেয়ে। মুখে বলবে একদম মিষ্টি খাব না। মিষ্টি খেলে গা গুলোয়।

আর মিষ্টি একবার হাতে পেলে রক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গে গপা গপ। তার ওপর পুরী কিংবা বেনারস বেড়াতে গেলে তো কথাই নেই। ট্রেণে উঠেও মিষ্টি। সেখানে গিয়েও মিষ্টি।

ট্রেণ তখন হুড় হুড় করে ছুটেছে। পাশের সিটে পা গুটিয়ে বসা এক বুড়ো অপন মনেই বলল—লেলুয়া গেল।

চন্দন ফিক করে হেসে ভাস্কর মামার দিকে তাকাল—লেলুয়া আবার কি গো মামা। লিলুয়া তো।

ভাস্কর মামা বলল—চুপ। শুনতে পেলে রেগে যাবে।

ট্রেণ ছুটছে তো ছুটছেই। দারুণ স্পিডে ছুটছে। ট্রেণের যাত্রীরা বার্থের ওপর শয্যা পেতে শুয়ে পড়ল সব।

ভাস্কর মামা বলল—নে শুয়ে পড়। ভোরবেলা নামতে হবে। চন্দনও শুয়ে পড়ল।

ওর মাথার কাছে ঝোলা ব্যাগে সেই ছোরা নাইলন দড়ি সব রেডি। কেননা ও জানে আজকাল ট্রেণ জার্নিতে মানুষের নিরাপত্তা নেই, যে কোন মুহূর্তে চোর ডাকাতের আবির্ভাব হতে পারে। ও শুয়ে-শুয়ে পিট-পিট করে দেখতে লাগল সে রকম কেউ ওঠে কিনা। উঠলেই দড়িটাকে ল্যাসোর মতো করে চোরের গলায় আটকে মারবে অ্যায়সা টান যে ঘুঘু মশাই ফাঁদে আটকে ছটফটাং। কিন্তু না। অনেকক্ষণ জেগে থেকেও সে রকম কারো অস্তিত্ব টের পেল না ও। অবশেষে ট্রেণের দুলুনিতে দু'চোখে জুড়ে ঘুম নেমে এলো ওর, ঘুম—ঘুম—ঘুম।

ঘুম ভাঙল ভাস্কর মামার ডাকে—এই ওঠ-ওঠ। জসিডি এসে গেছে। এই চন্দন।

চন্দন ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

—কিরে। কখন থেকে ডাকছি। উঠবি তো।

চন্দন বলল—যাঃ। এই তো ডাকলে তুমি।

—তোকে দু'তিনবার ডেকেছি। খুব ঘুমিয়েছিস তুই। বাবা-মা সবাই তখন উঠে দাঁড়িয়ে মালপত্তর হাতে নিয়েছেন।

চন্দনও ভাস্কর মামার পিছু-পিছু ট্রেণ থেকে নেমে পড়ল।



শেষ শরতের রাত্রি শেষের এই জসিডিতে এখন রীতি মতো ঠাণ্ডার ভাব। আর কি সুন্দর মুক্ত বাতাস। চন্দন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। ওরা ট্রেণ থেকে নামার একটু পরেই ছেড়ে দিল ট্রেণ। খুব অল্প সময় স্টপেজ। চলে যাওয়া ট্রেণের লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে চন্দন আপন মনেই একবার টা-টা করল।

টিকিটটা ওদের বৈদ্যনাথধাম পর্যন্তই ছিল। তাই ওভার ব্রীজ পেরিয়ে ওপাশের প্ল্যাটফরমে গেল ওরা। বৈদ্যনাথধামের ট্রেণও তখন দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। সে কি অপূর্ব পরিবেশ!

এরই মধ্যে কম্বল সোয়েটার সব বেরিয়ে পড়েছে এখানে। কিছু বাঙালি যাত্রী থাকলেও বেশির ভাগ যাত্রীই হিন্দুস্থানী। কিছু প্লাট-ফরমে কিছু ট্রেণের কামরায় উঠে বসে আছে। কেউ-কেউ ট্রেণের কামরায় বাঙ্কে উঠে শুয়ে আছে। চন্দনরাও একটা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন বগী দেখে উঠে বসল। এই শেষ রাতের ট্রেণে যাত্রী খুব বেশি নেই। কাজেই বেশ আরাম করে গুছিয়ে বসা গেল।

সুনন্দবাবু বললেন—বাবাঃ। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে তো এখানে?

চন্দন আর ভাস্করমামা প্লাটফরমে দাঁড়িয়েছিল। ওদেরও শীত করছিল। তবে গায়ে মাখছিল না।

দেবযানী বললেন—এই তোমরা উঠে এসো ভেতরে। নাহলে ঠাণ্ডা লাগবে।

চন্দন বলল—না। আমি এখুনি ভেতরে ঢুকব না। আমার একটুও শীত করছে না। তাছাড়া ট্রেণ ছাড়তেও দেরি আছে। এই

অন্ধকারে কি চুপ চাপ ভূতের মতো বসে থাকা যায়?

সত্যিই বগীতে আলো ছিল না। ছিল না মানে জ্বলছিল না। সব বগীই অন্ধকার। ইঞ্জিন না লাগা পর্যন্ত জ্বলবে না।

ভাস্কর মামা বলল—এখনো পঁয়তাল্লিশ মিনিট চুপ চাপ বসতে হবে।

সুনন্দবাবু বললেন—ততক্ষণে একটু করে চা খেয়ে নিতে পারলে হোত। একটা ভালো দেখে চা ওয়ালা ডাকো তো দেখি?

ভাস্কর মামা বলল—না না। এখানে চা ডেকে খাবার দরকার নেই, রেলের স্টলে যে চা তৈরী হয়, তা খুব ভালো। ঐ চা-ই নিয়ে আসছি আমি। বলে এগিয়ে গিয়ে চার কাপ চায়ের অর্ডার দিল ভাস্কর মামা।

সুনন্দবাবু নিজেও ট্রেণ থেকে নেমে এলেন এবার। তারপর ওদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

স্টল ওয়ালা চা দিতে এক কাপ চা জানালা গলিয়ে দেবযানীর দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে প্লাটফরমে দাঁড়িয়েই চা খেতে লাগলেন।

ভাস্কর মামা আর চন্দনও চায়ের পেয়ালা নিয়ে পায়চারি করতে করতে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। ভাস্করমামা চা খেতে খেতেই বলল—জানিস চন্দন, যে বাঙালী এই শেষ রাতে জসিডি স্টেশনে চা খেতে-খেতে একটু পায়চারি না করল তার জীবনই বৃথা।

চন্দন বলল—সত্যি মামা, চা যে কতখানি এনার্জিদায়ক, তা আজই প্রথম অনুভব করলাম। সত্যি, কি ভালো যে লাগছে।

চা খাওয়া শেষ হলে কাপ জমা দিয়ে ভাস্করমামা বলল—চল, একটু ওদিক করে এগিয়ে চল। একটা জিনিস দেখাবো তোকে।

ওরা পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল। মস্ত প্লাটফরম। তাই ধরে বেশ খানিকটা এগোবার পর এক জায়গায় ওরা অনেক পাখির কলরব শুনতে পেল। আকাশ তখনো অন্ধকার। তবে সামান্য ফিকে হয়ে আসছে। কিন্তু তারায়-তারায় ভরে আছে আকাশ।

ভাস্করমামা ডান দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—ঐ যে দূরের দিকে অন্ধকারে সব ঢাকা রয়েছে দেখছিস ঐ দিকে হল ত্রিকূট পাহাড়। আর

এ পাশেও আছে অনেক পাহাড়ের সারি। এগুলোর নাম জানি না। আমাদের এই ট্রেণটা নন্দন পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাবে।

—'নন্দন পাহাড়' নামটা খুব মিষ্টি, না? ঐ পাহাড়ে ওঠা যায়?

ভাস্করমামা বলল—কেন যাবে না? আসলে ওটা একটা ঢিবি। আমার মতে ওটাকে কখনোই পাহাড় বলা উচিৎ নয়। টিলা অবশ্য বলা যেতে পারে।

হঠাৎ পি-ই-প্ করে একটা ইঞ্জিন ভকস্ ভক্ ভকস্ ভক্ করতে করতে পাশ দিয়ে চলে গেল।

ভাস্করমামা বলল—চল, আর ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। এই ইঞ্জিনটাই আমাদের গাড়ির সঙ্গে লাগবে। সময়ও বেশি নেই।

ওরা ধীরে-ধীরে ওদের বগিটার দিকে এগিয়ে চলল।

এমন সময় যমদূতের মতো একটা লোক এগিয়ে এলো ওদের দিকে। লোকটা ভাস্করমামার দিকে তাকিয়ে বলল—কোথায় যাবেন বাবুরা, দেওঘর?

—হ্যাঁ।

—উঠবেন কোথায়?

—বিলাসী টাউন।

—কে পাণ্ডা আছে?

—শংকর।

—শংকর! কোন শংকর?

—বিলাসী শংকর। তবলা বাজায়। কেরামৎ খাঁ সাহেবের ছাত্র।

—অ। তা ওখানেই উঠবেন, না অন্য কারো বাড়ি যাবেন?

—আমরা যাবো একেবারে শেষ মাথায়। নিরুপম বসুর বাড়ি।

—অ। সমঝ গিয়া। তো তুম চারুভিলা যাওগে?

—হ্যাঁ। চারুভিলাতেই যাবো।

—কুছ দিন পহলে বহৎ বঢ়িয়া ডাকাইতি হো গিয়া হুঁয়া পর।

—তুমি তো সবই জানো দেখছি। তা ঐ চুরি যাওয়া মূর্তিটার কোন হদিশ পাওয়া গেছে?

লোকটি আর সে কথার কোন উত্তর না দিয়েই চলে গেল।

ভাস্কর মামা আর চন্দনও এলো ওদের বগীটার কাছে।

একটু পরেই, ইঞ্জিন জোড়া লাগল ট্রেণে। সব কম্পার্টমেণ্টে আলো জ্বলে উঠল। যথাসময়ে ছাড়ল ট্রেণ। শেষ রাতের আবছা আঁধারে সে এক অপূর্ব অভিযান।

বৈদ্যনাথধাম স্টেশনে ট্রেণ যখন থামল, আকাশের ঘোর তখনো কাটেনি, জসিডি থেকে বৈদ্যনাথধাম মাত্র একটিই স্টেশন। এর মাঝে আর কোন স্টেশন নেই। ওরা সকলে স্টেশনে ট্রেণ থেকে নেমে প্লাটফরমের বেঞ্চিতে বসে রইল।

কয়েকজন পাণ্ডাও ওদের তীর্থযাত্রী ভেবে সুরু করল নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু শংকর পাণ্ডার নাম শুনে বেশি বিরক্ত না করে সরে পড়ল যে যার।

এখানকার পাণ্ডাদের ভেতর এই একটা ভালো নিয়ম রয়েছে যে এরা যেমন নতুন যাত্রীদের নিজের করে পাবার জন্য ঝুলোঝুলি করে তেমনি অপর কোন পাণ্ডার যাত্রী পরিচয় পেলে আর তাকে জ্বালাতন করে না।

ভাস্করমামা বলল—শংকর আমাদের বহু দিনের পুরনো পাণ্ডা। আসলে ওর বাবাই পাণ্ডা ছিল আমাদের। এখন বাবা তো নেই। শংকর আছে। তবে শংকর এই সব যাত্রী ধরা ব্যবসা করে না। কেননা ও এখন এই অঞ্চলের এক বিখ্যাত তবলিয়া। ওর ছেলেরাই এ সব কাজ করে।

দেবযানী বললেন—আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগে এই সব ব্যাপার গুলো, তীর্থস্থানে আসব। ঠাকুর দর্শন করব। আবার যা মন চায় তাই দয়ে পূজো দেবো এই তো জানি। পাণ্ডার খপ্পরে পড়ব কেন?

ভাস্করমামা বলল—তুই বুঝিস না দিদি। আসলে যে কোন তীর্থে

পাণ্ডারা যেমনই বিরক্তিকর, তেমনি আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে এদের যে কোন একজনকে মেনে নেওয়া তেমনি বুদ্ধিমানের কাজ। বাইরে গেলে ছ'দশ টাকা খরচা করতেই হয়। কাজেই এদের মারফৎ ঠাকুরের পূজা-পাঠ করলে এরাও ঠাণ্ডা হয়, অন্যেও বিরক্ত করে না। এক সময় অবশ্য ছিল যখন এদের উপদ্রবে মানুষের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হোত। এখন আর সেদিন নেই।

ওরা যখন বসে-বসে নিজেদের ভেতর এইসব আলোচনা করছে তেমন সময় একজন টাঙ্গা ওয়ালা এসে বলল—টাঙ্গা লাগবে নাকি বাবুসাব ?

সুনন্দবাবু বললেন—হ্যাঁ লাগবে।

আকাশ তখন ফর্সা হয়ে গেছে। চারিদিকের গাছপালা ঘর বাড়ি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যদিও সকাল নয়, ভোর। তবুও এখন যাওয়া যেতে পারে। রাস্তায় লোকজনও চলচল করছে।

—কাঁহা যায়েঙ্গে ?

—বিলাসী টাউন।

—বিলাসী টাউন ? কাঁহা পর।

—একেবারে শেষ মাথায়। চারুভিলা জানতা ?

—হাঁ হাঁ। ঠাকুর বাড়ি।

—ঐখানে যাবো।

—চলিয়ে।

—ভাড়া কত নেবে ?

—ও লোক যিতনা বোলে গা।

দেবযানী বললেন—কে কি বলবে না বলবে সে কথা রাখো। তুমি কি নেবে তাই বলো দেখি ?

—আমি জায়দা ভাড়া নেবো না মা জী। দশ রুপিয়া লাগে গা।

ভাস্করমামা দেবযানীকে ইঙ্গিত করে বলল—ঠিক আছে।

ওরা সবাই টাঙ্গায় চেপে বসল।

চন্দন তো খুব খুশি। আসলে বিদেশে এসে টাঙ্গা চাপবার একটা

আনন্দ আছে। বিশেষ করে দেওঘর, রাজগীর এবং বুদ্ধগয়ায় টাঙ্গা না না চাপলে সত্যিকারের ভ্রমণ রসই পাওয়া যায় না। এখানকার পরিবেশ, বাতাসে নতুন জায়গায় আসার গন্ধ, সব কিছু চন্দনের মনকে পরিপূর্ণ করে তুলল। স্টেশন এলাকা ছেড়ে আসতেই এক জায়গায় একটা ঘড়ির টাওয়ার চোখে পড়ল।

ভাস্কর মামা বলল—আমরা এবার বাজারের পাশ দিয়ে মন্দির বাঁয়ে রেখে এগোতে থাকব।

চন্দন বলল—আচ্ছা মামা, তুমি কতবার দেওঘরে এসেছো ?

—সে কি মনে আছে ? তবে অনেকবার। আসলে ছোড়দির কাছে আসা-যাওয়া তো আমিই করি। এখানকার সব আমি চিনিয়ে দেবো তোকে। প্যাঁড়া গলি থেকে প্যাঁড়া কিনে খাওয়াবো।

টাঙ্গা তখন জনবহুল দেওঘর শহরের ওপর দিয়ে টুং টাং শব্দ করতে করতে বিলাসী টাউনের দিকে এগিয়ে চলেছে। শিব গঙ্গা বাঁয়ে রেখে সোজা বিলাসী টাউন ধরে যাবার সময় ডানদিকে একটি কালভার্টের পাশে বড় একটি অশ্বত্থ গাছের পিছনে 'অর্জুন নিবাস' নামে একটি বাড়ি দেখিয়ে ভাস্কর মামা বলল—ঐ আমাদের পাণ্ডার বাড়ি।

বাড়ির ভেতর থেকে তখন তুং তাং করে তবলার আওয়াজ আসছে।

যাই হোক। টাঙ্গাটা এই পথ ধরে আরো কিছুদূরে এক জায়গায় এসে থেমে গেল। সেইখানে রাস্তার ধারে বারো বিঘে জমির ওপর পাঁচিল ঘেরা বাগানের মধ্যে বহুদিনের পুরনো একটি বাড়ি। আগেকার দিনের চ্যাপ্টা-চ্যাপ্টা ইটের গাঁথনি দেওয়া। পাঁচিলের মরচে ধরা লোহার গেট খোলাই ছিল। সেটা পেরিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে একটু এগোলেই বাড়িটা। গেটের দু'পাশে বড়-বড় ইউক্যালিপটাশ গাছ। তাদের ধপ-ধপে সাদা বিশাল গুঁড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল চন্দন। কি সুন্দর। দূরে বহুদূরে পাহাড়ের রেখা। আর খুব সামনেই এক বিশাল পাহাড়। চন্দন অবাক হয়ে চেয়ে রইল সেই পাহাড়টার দিকে ভাস্কর মামা বলল—কি দেখছিস ? ঐ হচ্ছে ত্রিকূট।

চন্দন বলল—দুপুরে খেয়ে দেয়ে যাবে মামা ?

—দূর বোকা। ও কি এত কাছে নাকি যে যাবো? ও এখান থেকে অনেক দূর। ওখানে যেতে হলে ভোর-ভোর বেরোতে হয়। তারপর গাইড নিয়ে পাহাড়ে উঠে নেমে ফিরতে সেই বেলা একটা।

টাঙ্গাওয়ালা ওদের নামিয়ে দিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে যেতেই ওরা হাতাহাতি করে মালপত্তর নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ভেতরে ঢুকেই হাঁক দিল ভাস্কর মামা—ছোড়দি! এই ছোড়দি! কে এসেছে দেখ।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই রূপা মাসী ছুটে এলো—ওমা বড়দি! জামাইবাবু! আসুন-আসুন। কি ভাগ্যি। চন্দন তুই কত বড় হয়ে গেছিসরে!

দেবযানী আবেগে জড়িয়ে ধরলেন রূপাকে। তারপর বললেন—তোর চিঠি পেয়ে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। এতদিনের ঠাকুর তোদের।

—আর বলিস না দিদি। ঠাকুর চলে যাবার পর থেকে কি দুর্যোগ যে যাচ্ছে আমাদের। আজ এর অসুখ, কাল ওর অসুখ। তাছাড়া তোর ভগ্নিপতিরও মন মেজাজ ভালো যাচ্ছে না। মানসিক ভারসাম্য একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে। এক-এক সময় ভাবি কি যে হবে!

—নিরুপম কোথায়?

—এই একটু বেরিয়েছে। এসো-এসো, ভেতরে এসো।

ওরা পায়ে-পায়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

রূপা মাসির একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম বুবাই। মেয়েটির নাম বুবুন। খুবই ছোট। একটির বয়স পাঁচ অপরটির তিন।

চন্দনের সব কিছু দেখে শুনে মনে হল, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তা এইখানেই। এটা বাড়ি না তপোবন? না কোন আশ্রম? মাসীর অনেক ভাগ্য তাই এইরকম একটি পরিবেশে রয়েছে। তবে হ্যাঁ, এ যা জায়গা তাতে এখানে ধন-সম্পত্তি নিয়ে বাস করা যায় না। এই রকম নিরালা প্রান্তরে এত বড় একটা বাড়িতে কেনই বা ডাকাতি হবে না? একপাশে শূন্য মন্দির। ঠাকুর দালান। বাড়িটা বেশ

অভিনব। চারিদিকে ঘর, মাঝখানে উঠোন। পিছনের দিকে জল-কল বাথরুমের ব্যবস্থা।

ভেতরে যেতেই একজন বর্ষীয়সী মহিলা এগিয়ে এলেন। মুখে তাঁর বিষাদের ছায়া। বললেন এসেছো মা? আমরা তো সর্বস্ব খুইয়ে বসে আছি। আমাদের সাত পুরুষের ঠাকুর। এক সন্ন্যাসীর দেওয়া। এই ঠাকুর চুরি যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। সন্ন্যাসী, ঠাকুর দেবার সময় বলেছিলেন 'একে যত্ন করবি। নিত্য ভোগ দিবি। তবে মনে রাখিস এই ঠাকুর যেদিন চলে যাবে সেদিনই জানবি তোদের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে।' তাই কি যে ভয়ে-ভয়ে আছি বাবা, তা তোমাদের কি বলব। আমরা তো কখনো কোন অনাচার করিনি। তবে কেন এমন হ'ল?

দেবযানী, সুনন্দবাবু ভাস্করমামা ও চন্দন সকলেই প্রণাম করল তাঁকে। ইনি রূপা মাসীর শ্বাশুড়ি। খুব ভালো মানুষ।

দেবযানীর হাত ধরে তিনি সস্নেহে সকলকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

রূপা মাসীর বাড়িতে একটা চাকর ছিল। নাম বনমালি। সে কোথায় গিয়েছিল কে জানে। এখন পরিচয় পেয়ে সকলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম সুরু করল। বনমালির বয়স সাতাশ-আঠাশ। বেশ করিৎ-কর্মা লোক। ভাস্কর মামার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল যে তাতেই বোঝা গেল ভাস্করমামার সঙ্গে ওর দারুণ ভাব। ভাস্করমামাকে বনমালি 'মামাবাবু, মামাবাবু' করতে লাগল।

ভাস্করমামা বলল—তাহ'লে বনমালি, আমাকে আমার ঘরটা খুলে দাও। ঐ ঘরে আমরা দু'মামা-ভাগ্নায় থাকব। চন্দন তুই আমার কাছেই থাকবি তো?

চন্দন বলল—নিশ্চয়ই। মা রূপা মাসীর কাছে থাকুক। বাবা যেখানে হোক। আমি তোমার কাছ ছাড়া থাকছি না।

বনমালি সঙ্গে-সঙ্গে একটা ঘরের চাবি খুলে ঝাড়-মোছ করে সব পরিস্কার করে তক্তাপোষের ওপর বিছানা পেতে বেড কভার বিছিয়ে মনোরম করে তুলল। তারপর বলল—যান বাবুরা মুখ হাত ধুয়ে আসুন আগে, জামা প্যান্ট ছেড়ে ফেলুন। এখুনি হয়তো আপনাদের

চা-জল খাবারের ডাক পড়বে।

ভাস্করমামা ও চন্দন তাই করল। বাথরুমে মুখ-হাত ধুয়ে দাঁত মেজে একেবারে ঝকঝকে হয়ে নিল দু'জনে।

দেবযানী একটু ক্রীম মাখিয়ে দিলেন চন্দনকে। তারপর রূপা মাসীর সঙ্গে খোস গল্পে মেতে উঠলেন।

সুনন্দবাবুও এবার পোষাক পাল্টে তাঁর অতি সাধারণ লুঙ্গিটি পরে বাথরুমে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

রূপা মাসীর রান্নাঘরে তখন জনতা স্টোভে চায়ের জল ফুটছে।

রূপা মাসী বলল—জামাইবাবু এসেছে এতে যে আমার কি আনন্দ তা কি বলব। ওঃ কতবার যে বলেছি আসতে তার ঠিক নেই। তবে আসবার আগে একটা চিঠি দিতে পারতেন তো?

দেবযানী বললেন—কেন চিঠি পাসনি? আমরা তো রিজাভেশন করেই চিঠি দিয়েছিলাম। আমি নিজে লিখেছি চিঠি। তোর জামাইবাবুর ভুলো মন, পাছে ভুলে যায় তাই নিজে চিঠি পোস্ট করেছি।

—ওমা, সেকি! কই চিঠি পাই নি তো?

এমন সময় বিদ্যুতের মতো ঝলক লাগানো ফ্রক পরা একটি কিশোরী মেয়ে বেণী দুলিয়ে ছাদের সিঁড়ি বেয়ে নীচে এসে পাশের ঘরে ঢুকল। তারপর একটা মোটা বই বগলদাবা করে রান্না ঘরে এসে ঢুকল।

রূপার মাসীর শ্বাশুড়ি বললেন—কিরে, কোথায় ছিলি তুই?

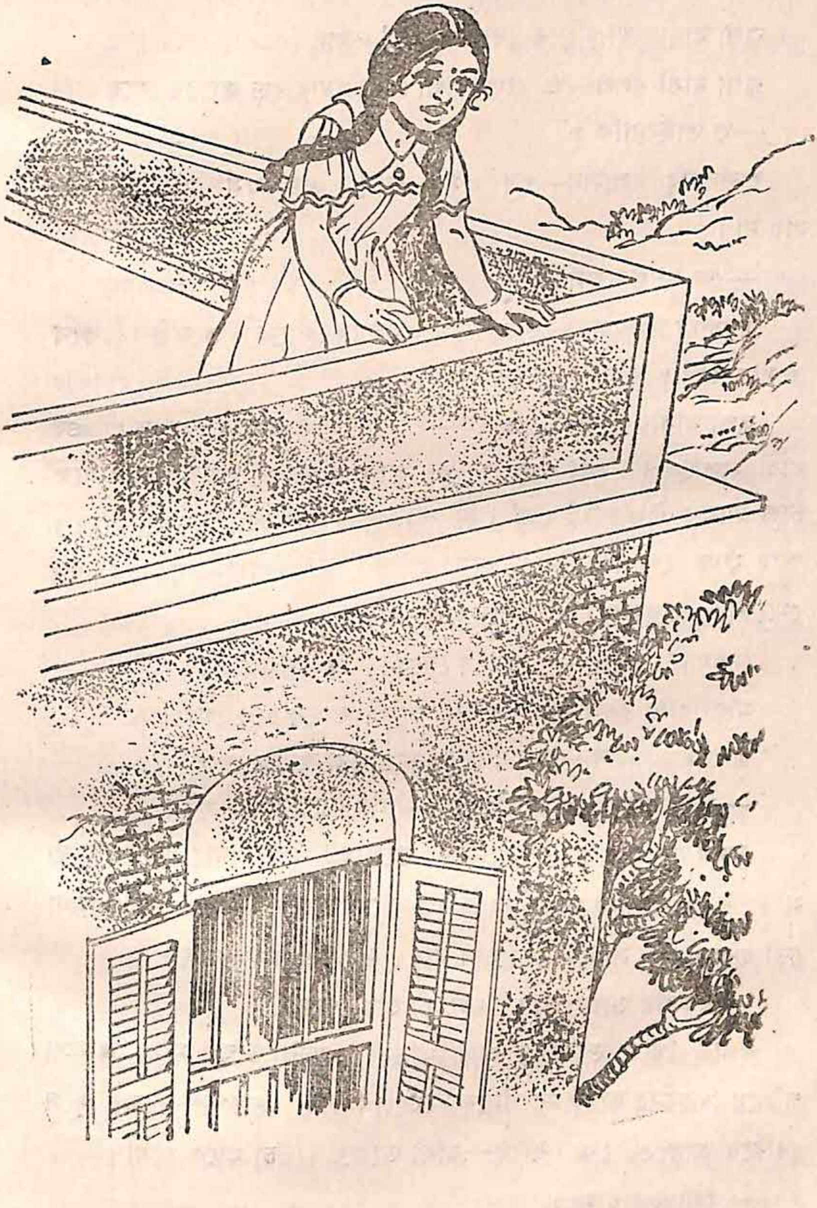
—আমি তো ছাদে পড়ছিলাম।

—অ। তাই ভালো, আমি ভাবছিলুম সাড়া শব্দ পাচ্ছি মা যখন, তখন নিশ্চয়ই কোথাও গেছিস তুই। যা তোকে পাহাড়ে পেয়েছে।

মেয়েটি বলল—এনারা কে দিদা?

—তোর কাকিমার বড়দি। জামাইবাবু। নে পেন্নাম কর।

মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে দেবযানী ও সুনন্দবাবুর পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল। ভাস্কর মামা তখন নিজের ঘরে ছিল তাই প্রণামটা পেল



না। থাকলে পেত নিশ্চয়ই।

দেবযানী বললেন—বাঃ। বেশ মেয়েটি তো। একেবারে ফুলের মতো। এটি কে মা?

রূপা মাসীর শ্বাশুড়িকে দেবযানী 'মা' বলেন।

রূপা মাসী বলল—ও হচ্ছে মালা। আমার বড় জায়ের মেয়ে।

—ও তাই নাকি?

সুনন্দবাবু বললেন—খুব ফর্সা তো। এত ফর্সা সচরাচর দেখা যায় না।

—ওর মা খুব ফর্সা।

দেবযানী বললেন—ওরা তো ধানবাদে থাকে শুনেছি। কবে এসেছে ওরা?

রূপা মাসীর শ্বাশুড়ি বললেন—ওরা মানে ও একাই এসেছে। ওর বাবা এসেছিল। কালী পূজোর পর আমি যাবো। তখন আমার সঙ্গে চলে যাবে। ঐ একটিই মেয়ে। দিন-রাত শুধুবই মুখে দিয়ে বসে আছে। আর ফাঁক পেলেই উধাও হয়ে যাচ্ছে। কি ঘোরান ঘুরতে পারে মেয়েটা। একদণ্ড ঘরের কোণায় থাকে না।

দেবযানী বললেন—চমৎকার মেয়ে।

মালা আর বসল না। প্রণাম করেই ওপরে চলে গেল।

রূপা মাসী বলল—চন্দন, তোর মামা কি করছে রে?

—মামা ও ঘরে শুয়ে আছে। মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে খুব।

চন্দন জানে, মামা এখন মোটেই শুয়ে নেই এবং মাথার যন্ত্রণাও হচ্ছে না। আসলে মামা ঘরের দরজা বন্ধ করে বিড়ি খাচ্ছে। কিন্তু একথা তো গুরুজনদের সামনে বলা যায় না। তাই ঐ কথা বলল।

—একবার ডাক তো। বল, চা হয়ে গেছে।

চন্দন গিয়ে ডাকতেই আধ খাওয়া বিড়িটা ভাস্কর মামা জানলা গলিয়ে পিছনের বাগানের দিকে ফেলে দিল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই চন্দন বলল—মাসী ডাকছে। চা খাবে এসো।

—যাচ্ছি, তুই যা।

চন্দন চলে আসার একটু পরেই ভাস্কর মামা এলো, রূপা মাসী বলল—এই শোন, চা খেয়ে তুই একবার তোর জামাইবাবুর খোঁজে যা দিকিনি। বনমালিই যেত। ওকে পাঠিয়েছি বাজারে।

রূপা মাসী চা আর টোষ্ট প্রত্যেককে ভাগ করে দিলেন। তারপর নীচের থেকেই ডাকলেন—মালা।

ওপর থেকে সাড়া এলো—কেন ?

—চা খাবি ?

—না।

সুনন্দবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন—আমি আসলে খুব নিরিবিলি জায়গা পছন্দ করি। কিন্তু তোমাদের এখানটা যে এত নিরিবিলি, এত মনোরম তা জানতাম না। এলাকাটাও তো শহরের শেষ প্রান্তে। দূরে পাহাড়।

—তবু তো ছাদে ওঠেন নি। ছাদে উঠলে শুধু পাহাড় আর বনভূমি দেখবেন। তাছাড়া আমাদের নিজেদের বাগানের গাছ-পালাই একটা ছোট খাটো বনভূমি।

চন্দন ছাদে ওঠবার জন্য উসখুস করছিল। তাই চা-টোস্ট খেয়েই বলল—মা, একবার ছাদে যাবে ?

রূপা মাসী বলল—তুই যা না !

ভাস্কর মামা বলল—চন্দন, আমার সঙ্গেও যেতে পারিস।

সুনন্দবাবু বললে—না-না, ওকে এখন কোথাও নিয়ে যেও না। একটু রেস্ট নিক। বিকেলে বরং যেখানে যাবার যাবে। সারা রাতের ট্রেণ জার্ণি। এখন স্নান করে খেয়ে দেয়ে আগে একটু ঘুমোক।

চন্দন বলল—আমি তাহ'লে ছাদে যাই ? বলেই সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে ছাদে উঠে এলো চন্দন।

প্রকাণ্ড ছাদ। হবে নাই বা কেন ? এই বাড়ির চৌহদ্দিটাই কি কম। ছাদে উঠেই দেখল চারদিকে শুধু পাহাড়—পাহাড়—আর পাহাড়। আলসে ঘেরা ছাদ। তাই ছাদের বাহার আছে। এক পাশের বাগানে কত ফুল গাছ। আর সেই দিকেই আলসের কোণে

সতরঞ্জি বিছিয়ে সেই লাল টুক-টুক কিশোরী মালা একমনে কি একটা বই যেন মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।

চন্দন পাহাড় বনভূমি ও মালভূমির সৌন্দর্য দেখতে-দেখতে পায়ে পায়ে সেই দিকে এগিয়ে এলো। ওর খুব ইচ্ছে হ'ল এই ফুট ফুটে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমাতে। কিন্তু মুসকিল হ'ল ও তো ওর সমবয়সী কোন মেয়ের সঙ্গে কখনো কথা বলেনি। তাই দূরের ত্রিকূট পাহাড়টার দিকে আঙুল দেখিয়ে আলাপের ভঙ্গিতে সলজ্জভাবে বলল —আচ্ছা, ঐ পাহাড়টার নাম কি?

মালা ওর দিকে না তাকিয়েই বলল—নেকু, সব জানে। বলে আর একটুও না বসে শতরঞ্জি গুটিয়ে নেমে এলো নীচে।

অপমানে চন্দনের মুখটা লাল হয়ে উঠল। একে ও অভিমানী ছেলে। তার ওপর এই অবহেলা। বেদনায় দুটি চোখ জলে ভরে উঠল ওর। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করল একবার যদি সুযোগ ও পায় তাহ'লে এই অপমানের চরম প্রতিশোধ ও নেবেই নেবে। গায়ের রঙ ফর্সা বলে এত অহংকার। সেও কি ফর্সা কম? কী স্পর্ধা, একেবারে মুখের ওপর বলে গেল 'নেকু'। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ।

চন্দন আহতও হ'ল। আবার মনে-মনে নিজেকে ধিক্কারও দিল। সত্যিই তো 'নেকু'। কেন সে নিজের থেকে যেচে কথা বলতে গেল? না গাল বাড়ালে এমন চড় তো সে খেত না। সে তো জানতই ওটা ত্রিকূট পাহাড়। তবু কেন গায়ে পড়ে জিজ্ঞেস করতে গেল?

এমন সময় ভাস্কর মামার গলা শোনা গেল—চন্দন! চন্দন!

—আমি এখানে।

ভাস্কর মামা উঠে এসে বলল—কিরে, কি হয়েছে তোর? মুখখানা এমন করে আছিস কেন?

—ও কিছু না। তুমি কই গেলে না মেসোমশাইকে খুঁজতে?

—জামাইবাবু এসে গেছেন। বনমালী বাজার যাচ্ছিল। যাবার পথে রাস্তায় দেখা পেয়ে খবর দিয়েছে।

—চলো তবে নীচে যাই। মেসোমশাইকে পেন্নাম ক'রে আসি।

—চল।. তারপর তোকে বাগানটা ঘুরিয়ে দেখাব।

চন্দন ও ভাস্কর মামা নীচে এসে নিরুপমকে প্রণাম করল।

নিরুপম জড়িয়ে ধরল চন্দনকে—থাক থাক বাবা।

চন্দন অবাক হয়ে গেল নিরুপমকে দেখে। একি হয়েছে মেসোর। সেই দীপ্ত চেহারার জৌলুষ কোথায় গেল? এক মুখ-দাড়ি। কেমন যেন পাগল-পাগল ভাব। ঠিক যেন গাছের ডালেই বোঁটায় আটকে শুকিয়ে আছে একটি ফুল।





ভাস্কর মামার সঙ্গে চন্দন একাত্ম হয়ে সুরু করল ঘুরে বেড়ানোর কাজ। এখন তো অখণ্ড অবসর। খাও দাও ঘুমোও গল্পের বই পড়ো আর ঘুরে ঘুরে বেড়াও। ভাস্কর মামা চন্দনকে নিয়ে এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে যে বিশাল বাগানটা আছে তাই ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল।

সত্যি কি মনোরম। এত বড় বাগান চন্দন এর আগে আর কখনো দেখেনি। কত যে জানা অজানা গাছ রয়েছে সেখানে তার যেন হিসেব নেই। ভাস্কর মামা আর চন্দন যখন বাগানে ঘুরছে তখন হঠাৎ দেখতে পেল একটি কাঁঠাল গাছের নিচু ডালে দোলনা খাটিয়ে এক মনে দোল খেয়ে যাচ্ছে কিশোরি মালা। ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে যেন একটি বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছে।

চন্দন সেদিকে তাকিয়েই এমনভাবে চোখটাকে অন্তদিকে ঘুরিয়ে নিল যেন সে ভ্রূক্ষেপই করছে না ওকে।

মালাই ভাস্কর মামাকে দেখে দোল খাওয়া থামিয়ে বলল—কি মামা, ভালো আছেন ?

ভাস্কর মামা হেসে বলল—হ্যাঁ, তোমার খবর কি ?

—ভালো, কখন এলেন ?

—সকালেই এসেছি। তুমি এসেছো জানতাম না তো।

—আমিও জানতাম না আপনি এসেছেন। ছাদে পড়ছিলাম কিনা।

—তোমার মা বাবার খবর ভালো ?

—হ্যাঁ। বাবা তো পূজোর আগে এসেছিলেন।

ভাস্করমামা আর চন্দন ঘুরে ঘুরে বাগানের গাছপালা দেখতে লাগল।

লাল মাটির কাঁকর পাথর মেশানো পথ। তারই দু'পাশে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, লেবু, পেয়ারা আরো কত কি গাছ। একপাশে ফলের, এক পাশে ফুলের।

একটা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে চন্দন বলল—মামা, এটা কি গাছ গো?

—এটা তো ইউক্যালিপটাশ।

—ও। আর ঐ যে ফুলের গাছ, ওগুলো? ওগুলোর নাম কি? একটার নাম অবশ্য আমি জানি, মাধবীলতা।

—তার পাশে মালতী, কুঞ্জলতা, অ্যান্টিগোনান আরো কত আছে।

—আর ঐ যে ঐ গাছগুলো?

—ওগুলো অবশ্য ফুল গাছ নয়। তবে নাম জানি না।

অমনি পিছন থেকে কে যেন সুরেলা গলায় বলে উঠল—ওগুলো জলপাই গাছ। আর ঐ হ'ল পীচ, ফসলা, চালতা, আতা।

ওরা দুজনেই চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল সেই কিশোরী মালা সামান্য একটু দূরত্ব বজায় রেখে কেমন নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করেছে।

ভাস্করমামা বলল—আরে মালা!

মালা হেসে বলল—হেন গাছ নেই যা আমাদের বাগানে নেই। সেইজন্যেই তো কত লোকের হিংসে। আগে দাদুর আমলে আরো কত গাছ ছিল। এই দিকটায় ছিল ইউক্যালিপটাশের সারি। বর্ষায় বৃষ্টি পড়লে ইউক্যালিপটাশের তীব্র গন্ধ যখন ছাপিয়ে উঠত চারদিকে আর টুপটাপ করে ঝরে পড়ত ইউক্যালিপটাসের ফল তখন আনন্দে ভরে উঠত মন।

চন্দন বিস্ময়ের সঙ্গে সবকিছু দেখতে লাগল। তবে মালার কথাগুলো শুনেও না শোনার ভান করতে লাগল ও। এমন কি ওর দিকে ফিরেও তাকাল না। ভাবটা এই, ও যেন নেই।

ভাস্করমামা কথা বলতে বলতে আরো একটু এগিয়ে বলল—আচ্ছা ওগুলো কি গাছ বলতো?

—ও গাছ চেনেন না? ওটা তো বকুল গাছ। ঐ বকুল, কামিনী, গন্ধরাজ, রক্তকরবী, ডলচি, মটুকঝাড়, হ্যামিলটোনিয়া, ম্যাগ্‌নোলিয়া, চাঁপা আর গ্রাণ্ডিফ্লোরা। ওদিকের গাছগুলোর পরিচয় নিশ্চয়ই দিতে হবে না—যুঁই, চামেলি, বেলি, গোলাপ।

ভাস্করমামা বলল—থাক থাক। আর বলতে হবে না। মাথা এমনিতেই ঘুরে যাচ্ছে, আরো ঘুরবে।. এত নাম মনে থাকে? কিন্তু এইসব গাছের যত্ন নেয় কে?

—আগে তো মালি ছিল। এখন বনমালীদাই দেখাশোনা করে। তাছাড়া আমি যখন আসি তখন আমিও দেখি।

—তুমি তো আসো ন-মাসে ছ-মাসে।

—হ্যাঁ, তবু দেখি। আসলে বিশ্বাস করুন ধানবাদে আমার একটুও ভালো লাগে না। কি বাজে জায়গা। শুধু বাবা মাকে ছেড়ে বেশিদিন কোথাও থাকতে পারি না তাই থাকি। পূজো হয়ে গেছে। এবার কালীপূজোটা হয়ে গেলেই চলে যাবো। ভাইফোঁটার দিন।

—ভাইফোঁটার দিন?

—হ্যাঁ, আমার তো ভাই নেই। তাই থেকে আর কি করব! ঐদিনই চলে যাবো।

চন্দনের হঠাৎ সেই অভিমানটা চাড়া দিয়ে উঠল। কেননা বাগান যখন এদের এবং এই মেয়েটি যখন ওকে 'নেকু' বলে অপমান করেছে তখন এইভাবে এদেরই বাগানে লোভির মতো ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি? বরং মালা যখন থাকবে না মানে দুপুরে ঘুমোবে তখন বরং চুপি চুপি ও একা এসে এই বাগানের সর্বত্র ঘুরে বেড়াবে এবং গাছপালার সঙ্গে মিতালি পাতাবে। তাই যেতে যেতে হঠাৎ বলল—আমার আর ভালো লাগছে না মামা, আমি যাই।

—সেকিরে! তোর বাগান বেড়াতে ভালো লাগছে না, এও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

—না। আসলে ট্রেণ জার্নি করে না ঘুমে আমার দু'চোখ জুড়ে আসছে।

মালা যেন কতকটা নিজের মনেই বলল—আহারে, দুধের বাছারে। ইচ্ছে করছে মুখে একটা পুপ্‌সি এনে ধরি।

চন্দন নীরবে আর একবার সহ্য করল এই মেয়েটির ঔদ্ধত্য। হাজার হলেও বাড়িটা এদের। তাই চোটপাট এখনি কিছু বলা যাবে না। তবে আর একটা কোনরকম বাজে কথা বললে ও বাবাকে বলবে সোজা হোটেলে উঠতে। বাবা ঠিকই বলেন কোথাও বেড়াতে গিয়ে কারো বাড়িতে উঠতে নেই। তাতে স্বাধীনতা থাকে না।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর তেড়ে ঘুম। ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। চন্দন আড়ামোড়া ভেঙে হাই তুলে উঠে বসল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাবে যেই অমনি বড় আয়নায় নিজের মুখটা দেখে চমকে উঠল। একি! ওর কপালের ওপর এ কিসের ললাট লিখন? চন্দন কাছে গিয়ে ভালো করে লিখনটা পড়ে বুঝল এতে যা লেখা আছে তা হ'ল 'নেকু'। এ নিশ্চয়ই ঐ দুর্বিনীত মেয়েটার কাজ।

চন্দন তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে ভালো করে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলল। তারপর রান্নাঘরে ওর মা রূপা মাসী যেখানে বসে গল্প করছিল সেখানে এলো।

মাসী বলল—বাবা! তুই খুব ঘুমিয়েছিস তো? আসলে গাড়িতে ঘুম ঠিক মতো হয়নি।

দেবযানী বললেন—না না। গাড়িতে বেশ ঘুমিয়েছে ও।

চন্দন বলল—মা, বাবা কোথায়?

—তোর মেসোর সঙ্গে বেরিয়েছে।

—ভাস্করমামা?

মাসী বলল—ওর কথা আর বলিস না। পাকা সিনেমা খোর একটা। ঠিক সিনেমায় গেছে।

এমন সময় দেবযানীই বললেন—আচ্ছা, মালাকে দেখছি না তো ?

—ওর দেখা এখন পাবি ? ওরকম ধিঙ্গি মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। দিনরাত শুধু টো-টো করে ঘুরছে। আগে এ রকম ছিল না। এই বারেই এরকম করছে। বড় হচ্ছে। কিন্তু কোন ভয় ডর নেই। যা দিনকাল পড়েছে তাতে একা একা অতবড় মেয়ের ঘোরা কি ঠিক ?

—কেন, কোথায় যায় ও ?

—সে ও-ই জানে। ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে মাকে একটু চা করে দেয়—।

—তোর শ্বাশুড়িকে ?

—হ্যাঁ। মা খুব ভোরে চা খান তো ? তারপর সেই অন্ধকারেই ধিঙ্গি মেয়ে সাইকেলে চেপে মর্নিং-ওয়াক করতে যান। ফেরেন বেলা সাতটা আটটা, কোনদিন নটায়।

—সেকি!

—তবে আর বলছি কি। তারপর খেয়েদেয়ে দুপুরে ছাদে বসে বই পড়ে বিকেলে আবার বেরোয়। ফেরে সন্ধ্যের পর। কোথায় যে যায় ভগবান জানে। বাবা নতুন সাইকেল কিনে দিয়েছে তাই নিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চষে বেড়াচ্ছে। মা-ও কিছু বলেন না। আসলে বাপের এক মেয়ে তো, আদর পেয়ে মাথায় উঠেছে।

রূপা মাসী একটা ডিসে করে দুটো নিমকি আর দুটো প্যাঁড়া খেতে দিলেন চন্দনকে। চন্দন তাই খেয়ে নিজের ঘরে চলে এলো। মানে এখানে যে ঘরে ও আছে। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে পেরেকে ঝোলানো ওর ব্যাগটা নিয়ে এসে তক্তাপোসের বিছানায় গুছিয়ে বসল। ওর একমাত্র প্রিয় সঙ্গী বইগুলো খুলে ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে দেবে ও। কিন্তু একি! ব্যাগের ভেতর থেকে এসব কি বেরোচ্ছে ? কোথায় গেল পাণ্ডব গোয়েন্দা, কোথায় গেল ভূতের গল্প ভয়ঙ্কর! নকুড়মামা, দুরন্ত তপাই, দীঘা সৈকতে আতঙ্ক, ভাঙা দেউলের ইতিকথা, কিশোর গল্প সংকলন একটা বই-ও নেই। তার জায়গায় বেরোতে

লাগল পাতা ছেঁড়া ব্যাকরণ কৌমুদী, ইংলিশ গ্রামার এ্যাণ্ড কম্পোজিসন, ভূগোল ও বিজ্ঞানের বই। তার সঙ্গে বেরলো একটা চিঠি 'প্রিয় নেকু, তোমার এখন লেখাপড়া করবার সময়। এই বয়সে এইসব বই না পড়ে এই বইগুলো পড়ো। আখেরে কাজ দেবে। আপাততঃ বইগুলো আমার জিম্মায় রেখে দিলাম। বাড়ি যাবার আগে চেয়ে নিও কেমন ?'

চন্দন 'ওফ' করে একবার লাফিয়ে উঠল। নাঃ এক্ষুনি এর একটা প্রতিকারের দরকার হয়ে পড়েছে। একবার ভাবল ও ছোট মাসীকে গিয়ে সব কথা খুলে বলে, আবার ভাবল বলেই বা লাভ কি ? ছোট মাসীর কথায় তো বোঝাই গেছে বাপের আদুরে মেয়েটি আউট অব কণ্ট্রোল। ওকে অন্য উপায়ে জব্দ করতে হবে। কেননা ও বড়ই দুর্বিনীত।

চন্দন আর না দাঁড়িয়ে সোজা মালার ঘরের দিকে চলে গেল। ধিঙ্গি মেয়ে তো এখনো ফেরেনি। ও ব্যাকরণ গ্রামার ভূগোল ইত্যাদি বইগুলো ঘরের শিকল খুলে মালার বিছানায় রেখে একপাশে পড়ে থাকা একটি বাক্সর ডালা তুলে দেখল ওর বইগুলো সেখানে আছে কিনা। কিন্তু তুলেই দেখল সব ভোঁ ভোঁ। পাতা ছেঁড়া দু'একটা পত্র পত্রিকা ছাড়া আর কিছু নেই। তবে একটা চিঠি ছিল। তাতে লেখা ছিল 'হায় হায় নেকুরে, কি বুদ্ধু তুমিরে, কি দারুণ বোকারাম, তুমি একটি হাঁদারাম। আমি তোমার মতো অত বোকা নই যে বইগুলো তোমার হাতের কাছে রেখে যাবো। যাও ঘরে যাও।'

চিঠি পড়ে চন্দন প্রায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। কি ফাজিল মেয়েরে বাবা। এমন মেয়ে তো দেখা যায় না। এ যেন ধানবাদের ধানি লংকা। কিন্তু একবার রেগে উঠলেও পরক্ষণেই নরম হয়ে গেল গেল চন্দন। কেননা ও বুঝল এর ওপর রাগ করে কোন লাভ নেই। এই মেয়ের প্রকৃতিই এইরকম। তবে হ্যাঁ, পাণ্ডব গোয়েন্দার বাচ্চু বিচ্ছুকেও এ মেয়ে ছাপিয়ে যায়।

চন্দন যখন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না কিভাবে ও মালাকে জব্দ করবে তেমন সময় ওর বাবার গলা শুনতে পেল। সঙ্গে মেসোরও।

চন্দন ঘর থেকে বেরিয়ে ওর মা-বাবার কাছে এলো।

সুনন্দবাবু বললেন—আমরা একবার থানায় গিয়েছিলাম বুঝলে?

রূপা মাসী বলল—কি বলল ওরা?

—পুলিশ বলল, দেখুন সুরাহা আমরা কিছুই করতে পারিনি। তবু এটুকু বলতে পারি আপনারা অযথা আমাদের যেন ভুল বুঝবেন না। আসলে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি কিন্তু এমন ভাব দেখাচ্ছি যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি আমরা। কেননা আমরা আশা করছি ঐ মূর্তিটা এই অঞ্চলের আসেপাশেই কোথাও আছে। এই এলাকার বাইরে মূর্তি পাচার হবার সব রকম রাস্তা এমনিতেই বন্ধ। তাই ওৎ পেতে বসে আছি ওদের ধরবার জন্য। আমরা যদি তৎপর হই তাহলে ওরা সাবধান হয়ে যাবে। আর আমরা যদি অলসতার ভান দেখাই তাহলে আমরা হাল ছেড়ে দিয়েছি ভেবে এক সময় নিশ্চিন্ত হয়ে ওরা মাল পাচার করতে যাবে এবং ধরা পড়বে। আমরা দেখেছি এই পরিকল্পনায় অনেক সময় অনেক ক্রীমিন্যাল ধরা পড়েছে।

নিরুপমবাবু বললেন—ওরা বলল আমরা শুনে গেলাম, তবে ওসব লাল মাখানো কথায় কি চিড়ে ভিজবে? সব ব্যাটাদের বদমায়েসী। এদেরও ষড়যন্ত্র আছে।

সুনন্দবাবু বললেন—না না। আমার কিন্তু এদের কথা শুনে তা বলে মনে হ'ল না। সব সময় সবাইকে সন্দেহ করা উচিত নয়।

রূপা মাসী বলল—আসলে ব্যাপার কি জানেন জামাইবাবু, আমরা এখানে এই এতখানি সম্পত্তি ভোগ করছি তো তাই এখানকার লোকেদের হিংসে খুব। এরা চাইছে আমাদের জ্বালাতন করে এখান থেকে তাড়াতে।

সুনন্দবাবু বললেন—সে তো তোমরা মনে করছ। আসলে তা নাও তো হতে পারে?

নিরুপমবাবু বললেন—তোমরা এখানকার লোককে চেনো না ভায়া। বড় স্বার্থপর এরা।

দেবযানী বললেন—সে কোন জায়গায় নয় ?

এমন সময় দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল।

রূপা মাসীর শ্বাশুড়ি একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে বললেন—তাই তো, মেয়েটা এখনো এলো না, গেল কোথায় ?

রূপা মাসী বলল—মা, আপনি একটু শক্ত হোন এবার। দিনকাল এখন খুব খারাপ পড়েছে। তার ওপর এইরকম একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। এর পরেও কখনো রিস্ক নেয় কেউ ? কি আছে কপালে তা কে জানে ?

নিরুপমবাবু বললেন—না না এ তো ভালো কথা নয়, ওর মা-বাবা যখন থাকে তখন যা করে করুক। এখন কিছু হলে সব দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপবে। ও ফিরে এলে বেশ কড়া কথায় বারণ করে দাও ওকে। এসব এখানে চলবে না।

বলতে বলতেই সাইকেল নিয়ে লম্বা বেণী দুলিয়ে ফ্রক পরা কিশোরী মালা গট গটিয়ে ঘরে ঢুকল।

নিরুপমবাবু বললেন—এত সন্ধ্যে অব্দি রোজ রোজ বাইরে থাকিস কেনরে ? বাড়ি শুদ্ধু লোক ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি আমরা।

রূপা মাসীর শ্বাশুড়ি বললেন—বড্ড বাড় বেড়েছো তুমি দাঁড়াও। কি দস্যি মেয়েরে বাবা। এমন আমি বাপেরকালে দেখিনি।

মালা কারো কথায় ভ্রূক্ষেপও না করে সোজা কলতলায় গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে এসে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে এঘর ওঘর করল। তারপর এক সময় বলল—আচ্ছা কাকু! আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন, কাকাহিগড় কোথায় ?

নিরুপমবাবু বললেন—কাকাহিগড় ? কি জানি নাম শুনিনি কখনো।

—আছে আছে। একটা জায়গা আছে। কিন্তু কোনদিকে ?

—যেদিকেই হোক। তোকে অত খোঁজ নিতে হবে না। কাল

থেকে একদম ঘর থেকে বেরোবি না। কি ভেবেছিস কি? কিছু একটা হয়ে গেলে তোর বাবাকে কি কৈফিয়ৎ দেবো বলতো?

মালা সঙ্গে সঙ্গে রূপা মাসীর শ্বাশুড়িকে জড়িয়ে ধরে বলল—ওঃ দিদা! তোমার ছোট ছেলেকে একটু চুপ করতে বলবে? কেবল শাসন আর শাসন। ভাল্ লাগে না বাবা। দুদিন এলাম কোথায় বেড়াতে।

রূপা মাসী বলল—অন্য কিছু নয় মা। দিনকাল কিরকম খারাপ পড়েছে দেখছিস তো? কেউ যদি ধরে নিয়ে চলে যায় তখন কি করবি? আর কি কচি খুকিটি আছিস?

মালা বলল—না গো না। দেওঘর এখনো অত খারাপ জায়গা হয়নি। এই বাড়িতে একবার একটা ডাকাতি হয়ে গেছে বলে তোমরা সব সময় আতঙ্কে আছো। নাহলে এই দেওঘরে সারা বছর ধরে হাজার হাজার মানুষ তীর্থ করতে, বেড়াতে, হাওয়া বদল করতে আসছে। তাহলে সবার সব ছেলেমেয়েই চুরি হয়ে যেত।

নিরুপমবাবু বললেন—দিনমানে হলে তো ভয় কিছু ছিল না। তুই তো অসময়ে যাস। রাস্তায় যখন কোন লোক থাকে না। হয় ভর-সন্ধ্যেবেলা নয় তো ভোরের অন্ধকার এই তো তোর বেড়াবার সময়।

রূপা মাসীর শ্বাশুড়ি বললেন—কাল থেকে একদম বাইরে বেরোবে না। ঐ তো একটা ছেলে এসেছে বাড়িতে। ওর সঙ্গে গল্প কর, বাগানে ঘোর। এত বড় বাগান রয়েছে তা নয়। কেবল বাইরে ঘোরা। ছেলেটার সঙ্গে একবারও কথা বলেছিস তুই?

মালা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে একটা হাই তুলে আড়ামোড়া ভেঙে বলল—বড্ড ক্ষিদে পাচ্ছে। কাকিমা প্লিজ আমি ঘরে গিয়ে একটু শুচ্ছি তুমি আমাকে একটু হালুয়া করে খাওয়াও। বলেই চলে গেল মালা। গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করল।

রূপা মাসীর শ্বাশুড়ি বললেন—চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী। কি মেয়েই হয়েছ মা।

দেবযানী এতক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলেন মালাকে। এবার

বললেন—ওর দুষ্টুমি আমি ছাড়াচ্ছি দাঁড়ান। আমার চন্দন একটু বড় হোক। ওর সঙ্গেই আমার ছেলের আমি বিয়ে দেবো। কি চমৎকার মেয়ে।

চন্দন বাইরে ছিল। এই কথা না শুনেই ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। মা-টা যেন কি! কবে বড় হবে চন্দন আর এখন থেকেই মা এই সব স্বপ্ন দেখছেন? পালিয়ে এসে চন্দন ঘরে ঢুকে দরজাটা আলতো করে ভেজিয়ে বিছানায় শুয়ে রইল চুপচাপ। ভাস্কর-মামা কখন আসবে কে জানে? যদি সত্যিই সিনেমায় গিয়ে থাকে তাহলে তো আসতে রাত হবে।

বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর হঠাৎ কি ভেবে যেন উঠে দাঁড়াল চন্দন। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির পাশে কোণের ঘরের দরজাটা একটু ঠেলে ফাঁক করতেই দেখল এ বাড়ির চাকর বনমালী হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে কি যেন একটা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছে।

চন্দন ভেতরে ঢুকতেই বনমালী বলল—আরে চন্দনবাবু, এসো এসো। সারাদিন তো কাজ কাজ করে তোমার সঙ্গে আলাপই করা হয়নি। এসো, ভেতরে এসো।

চন্দন বলল—এই তোমার ঘর? খুব ছোট্ট, কিন্তু বেশ পরিষ্কার তো।

বনমালী বলল—পরিষ্কার না হয়ে উপায় আছে? একটুকু নোংরা দেখলে ঠাকুমা বাকুনির চোটে ভুবন অন্ধকার করিয়ে দেবেন না?

ঠাকুমা অর্থে রূপা মাসীর শ্বাশুড়ি।

চন্দন বলল—উনি খুব বকেন বুঝি?

—না না। শুধু শুধু বকেন না! তবে এতটুকু নোংরাও যেমন উনি দেখতে পারেন না, তেমন কোন অন্যায়ও সহ্য করতে পারেন না। আর কথা না শুনলে খুব রেগে যান।

—কে বললে? আমি তো দেখছি ওনার নাতনির একটার পর একটা অন্যায় উনি সহ্য করে যাচ্ছেন। কই কিছু তো বলছেন না?

—ঐ একটি জায়গাতেই উনি খুব নরম। আসলে মালা দিদিমণি তো বাপের এক মেয়ে। আর খুব অভিমানী। সেইজন্যে কেউ কিছুই বলে না ওকে।

—তাহলে তো মাথায় চেপে বসবে।

—আরে বসবে কি! বসেছে তো। তা যাক। ঠাকুমা বকা ঝকা করলেও ঠাকুমার মতো মানুষ হয় না। আমার যখন আট বছর বয়স তখন উনি পুরী বেড়াতে গিয়ে আনন্দবাজার থেকে আমাকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেন। আমার তো কেউ কোথাও ছিল না। তাই ওনার শিক্ষায় মানুষ হয়েছি আমি। রোজ ভোরে উঠে স্নান করি। ঠাকুরের ফুল তুলি। ঘরের কাজ করি।

—ঠাকুরের ফুল? ঠাকুর তো এখন নেই।

—নাই বা রইল। ঠাকুমা যে ঐ বেদীকেই ফুল দিয়ে সাজান। কত কাঁদেন ঠাকুরের জন্যে। ঠাকুমার বিশ্বাস তাঁর রাধাকৃষ্ণ আবার ফিরে আসবে ঐ সিংহাসন আলো করে।

চন্দন বলল—ঠাকুমার বিশ্বাস হলেও আমার তো মনে হয় না আসবে। অত দামী জিনিস, আজ কতদিন হ'ল খোয়া গেল। আর কখনো ফেরৎ পাওয়া যায়?

বনমালী বলল—চন্দনবাবু, একটা কথা আছে জানো তো, 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর', ঠাকুমার বিশ্বাস সন্ন্যাসী প্রদত্ত এই ঠাকুর কখনোই চুরি যাবার নয়। কেননা এখনো তাঁরা এমন কোন অনিয়ম বা অনাচার করেন নি যাতে বিগ্রহ কুপিত হয়ে চলে যেতে পারেন। তবু চলে যখন গেছেন তখন ধরে নিতে হবে তাঁর প্রতি গৃহস্থের আন্তরিকতা কতখানি তা পরীক্ষা করবার জন্যই হয়তো তিনি ছলনা করেছেন। কাজেই একান্তভাবে তাঁকে ডাকলে মনে হয় আবার তিনি ফিরে আসবেন।

চন্দন সব শুনল। তারপর একসময় বলল—আচ্ছা বনমালীদা, বলতে পারো কাকাহিগড় কোথায়?

—কাকাহিগড়!

—হ্যাঁ, কাকাহিগড়।

—ও নাম তুমি কোত্থেকে শুনলে ?

—যেখান থেকেই হোক শুনেছি। জায়গাটা কোথায় ?

—কাছাকাছিই আছে। দেওঘর শহরের পশ্চিমদিকে। কিন্তু ঐ জায়গার ওপর তোমার এত কৌতূহল কেন ?

—এমনি। নামটা খুব পছন্দসই কিনা, তাই।

—ওটা বুনো জায়গা। ঝোপঝাড় টিলা আর মস্ত একটা ঢিপি আছে। তার আশেপাশে আছে কিছু ক্ষেতি জমি। ইদানিং এক সাধুবাবা এসেছেন ওখানে। কিন্তু তুমি কার মুখে শুনলে ?

—মালা জানতে চাইছিল কিনা, তাই।

—অ-। মালা দিদিমণি। তাই বলো। ভারী দুষ্টু মেয়ে। তবে মন ওর খুব ভালো।

চন্দন মনে মনে বলল 'ছাই', মুখে বলল—আমাকে একদিন নিয়ে যাবে সেখানে ?

বনমালী কিরকম যেন করুণ চোখে একবার তাকাল চন্দনের দিকে। তারপর বলল—চন্দনবাবু, তুমি আর যেখানে যেতে চাও আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। শুধু কাকাহিগড়ে যেও না। দুদিনের জন্য এসেছ! ভালো ভালো জায়গায় ঘোরো বেড়াও। খাও দাও। মন্দির দেখো, পাহাড় দেখো কিন্তু কাকাহিগড়—। না না না—।

—আমার মনে হচ্ছে ওটা খুব রহস্যময় জায়গা, তাই না ?

—ঠিক তাই। আর তাছাড়া ওখানকার তিনি সাধুবাবা তিনি খুব একটা সুবিধের লোক নন। শুনেছি ওখানে উনি চামুণ্ডা দেবীর কাছে নরবলি দেন।

—সেকি! এই সভ্য যুগে নরবলি ? এত কড়া প্রশাসন সত্ত্বেও।

—বাবু, যারা ক্রীমিন্যাল তারা কি আইন কানুন কখনো মানে ? না ভয় করে ? তা যাক যে, ওসব কথা থাক। চলো কাল ভোরবেলা স্নান করে ঠাকুরের ফুলটুল তুলে দিয়ে তোমাকে নিয়ে এক জায়গায় বেড়াতে যাই।

—কোথায় বনমালীদা ?

—নন্দন পাহাড়ে। ভোরের আবছায়ায় পায়ে হেঁটে নন্দন পাহাড়ে বেড়াতে যেতে কি ভালো যে লাগে তা কি বলব।

—ঠিক আছে যাবো। যদি ঘুমিয়ে পড়ি তো আমাকে ডেকে নিও কেমন ? পারি তো ভাস্করমামাকেও সঙ্গে নেবো।

—মামাবাবুকে ? তুমি নেহাৎই ছেলেমানুষ চন্দনবাবু। তোমার মামাবাবুকে যদি বেলা আটটার আগে ঘুম থেকে তুলতে পারো তো তোমাকে চারটে পাকা পিয়ারা খাইয়ে দেবো আমি।

এমন সময় রান্নাঘর থেকে রূপা মাসী হাঁক দিলেন—চন্দন একবার এদিকে আয়।

—যাই মাসীমা। বলে চন্দন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। যাবার আগে বলল—তাহলে ঐ কথাই রইল, কেমন ?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

চন্দন রান্নাঘরে ঢুকতেই দেখল সেই দুর্বিনীত মেয়ে মালা বসে মনের আনন্দে হালুয়া খাচ্ছে। রূপা মাসী চন্দনের দিকেও এক প্লেট হালুয়া এগিয়ে দিলেন। চন্দন সবে হালুয়াটা খেতে যাবে এমন সময় বাইরে ভাস্করমামার চেঁচামেচি শোনা গেল—চোর—চোর—পাকড়ো—পাকড়ো —জামাইবাবু!

নিরুপমবাবু এবং সুনন্দবাবু দালানে বসে গল্প করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন একটি লোহার রড এবং অন্যজন একটি দরজার খিল নিয়ে ছুটে বাইরে এলেন—কই, কোথায় চোর!

খাবার ফেলে চন্দন, মালা, রূপা মাসী, মা সবাই ছুটে এলেন বাইরে।

ভাস্করমামা বলল—আমি পাঁচিলের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকছি হঠাৎ দেখি তিন চারজন লোক দৌড়ে পালাল।

নিরুপমবাবু বললেন—কোনদিকে গেল ?

—বাগানের দিকে।

—তাহলে বেরোতে পারবে না। দুটো টর্চ নিয়ে এসো তো দেখি ?

মালা সঙ্গে সঙ্গে টর্চ আনতে ঢুকল।

রূপা মাসী বলল—না-না। বাগানে যেতে হবে না, এত রাতে অন্ধকারে। যদি পিছন থেকে লোহার রড-ফড মারে তখন? তাছাড়া আজকাল ওদের কাছে বোমাও থাকে।

—তাই বলে চুপচাপ বসে থাকব? একটু তাড়াতুড়ি না করলে হয়? আর এখন তো আমি একা নই।

এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে মালা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তারপর টর্চ হাতে ছুটে এসে বলল—ও কাকা গো, আমার সাইকেলটা দেখতে পাচ্ছি না।

রূপা মাসী বলল—সেকি! কোথায় ছিল সাইকেল?

—দালানে দরজার পাশে।

সুনন্দবাবু এবং নিরুপমবাবু দুজনেই অবাক—দালানে! আমরা তো ঠায় বসে আছি। আমাদের নজর এড়িয়ে কখন কোন ফাঁকে নিয়ে পালাল?

রূপা মাসী বলল—চাবি দিস নি সাইকেলে?

—না।

নিরুপমবাবু বললেন—তাহলে তো দেখতেই হচ্ছে। বাগানের দিকে যদি ওরা গিয়ে থাকে তো সাইকেল নিয়ে পালাতে পারবে না।

অতএব দলবদ্ধ হয়ে ওরা বাগানের দিকে এগোতে থাকল। চন্দন আর মালাও সঙ্গ নিতে ছাড়ল না। শুধু রূপা মাসী ও দেবযানী রইলেন সদরের দিকে প্রহরায়।

কিন্তু না, বাগানের একদম ভেতর পর্যন্ত ঢুকেও কারো পাত্তা পাওয়া গেল না। সেই সঙ্গে সাইকেলটারও কোন হদিস মিলল না। অতএব ফিরে এলো সকলে। মালার চোখ দিয়ে সমানে জল ঝরছে। মালার অবস্থা দেখে ওর প্রতি আর কোন রাগ বা ক্ষোভ রইল না চন্দনের। একটু সান্ত্বনার সুরে বলল চন্দন—কি হবে কেঁদে? তোমার বাবাকে বোলো আবার নতুন সাইকেল কিনে দিতে।

মালা ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল—বাবা আর দেবেন না। তাছাড়া

এরকম সাইকেলও হবে না আর। একেবারে আমার মনের মতনটি ছিল। তাছাড়া সাইকেলটা চুরি গিয়ে এই মুহূর্তে আমার যে কি ক্ষতি হয়ে গেল তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমার এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

—একটা সাইকেলের জন্য তোমার এমন কি ক্ষতি হ'ল যে তুমি এত ভেঙে পড়েছো?

—সে তুমি বুঝবে না। কেউ বুঝবে না। কাউকে বলা যাবে না সে কথা। সাইকেল যদিও বাবা আবার কিনে দেন তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।

মালার বক্তব্য ক্রমশই যেন রহস্যময় হয়ে উঠল চন্দনের কাছে। তবে ও বুঝতে পারল এই ফুটফুটে কিশোরী মেয়েটি আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়।

যাই হোক। ওরা সকলে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করে যখন শুতে গেল রাত তখন এগারোটা।





রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎ দরজায় টক-টক শব্দে শুনে ঘুম থেকে উঠে বসল চন্দন। ভাস্করমামা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। উঃ। সে কি দারুণ নাক ডাকার শব্দ। এমন ঘুম কেউ ঘুমোতে পারে?

চন্দন পা টিপে-টিপে দরজার কাছে এসে সাড়া দিল—কে?

—একবার দরজাটা খুলবে?

এ তো মালার গলা। এত রাতে মালা ওকে দরজা খুলতে বলছে কেন? তবে কি আবার নতুন করে কোন বিপদ হয়েছে? কিন্তু তা যদি হোত তাহলে তো ভাস্করমামাকে ডাকত। যাই হোক, চন্দন এক মুহূর্তও দেরী না করে খুলে ফেলল দরজাটা।

—কি ব্যাপার!

মালা ঠোঁটে তর্জনী রেখে চাপা গলায় বলল—চুপ, তারপর বলল—একবার এদিকে এসো তো।

চন্দন দরজার কাছ থেকে একটু সরে এলো। মালা ওর হাত ধরে প্রায় টানতে-টানতে সিঁড়ি ভেঙে ওকে টেনে নিয়ে গেল ছাদে। তার পর ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে বলল—ঐ দেখো।

চন্দন তাকিয়ে দেখল বহুদূরে বাগানের ঘন গাছ-পালার আড়ালে ছায়া-ছায়া কালো-কালো কারা যেন ঘোরা ফেরা করছে। সামনেই কোজাগরী পূর্ণিমা। তাই জ্যোছনায় ফুল ফুটে যাচ্ছে চারিদিকে।

চন্দন বলল—বেশ রহস্যময় ব্যাপার তো।

মালা বলল—আমি ওদের অনুসরণ করতে চাই।

চন্দন বলল—তুমি কি পাগল হয়েছ মালা? ওরা কারা? দলে ওরা কতজন তা কি জানো?

—চন্দনদা, তুমি যদি আমার পাশে থাকো, তাহ'লে আমি কাউকে ভয় পাবো না। তুমি না এলে আমি একাই যাবো। এতদিন তো একা একাই সব কিছু করছিলাম আমি। কিন্তু তুমি যখন রয়েছো তখন···।

—একা একা কি করছিলে তুমি ?

—সে অনেক কিছু। পরে সব বলব তোমাকে।

—তোমার সঙ্গে যেতে আমার একটুও আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি জেনে রেখো যে আশায় তুমি যাচ্ছো, তা কিন্তু সফল হবে না। অর্থাৎ ঐ সাইকেল তুমি আর ফিরে পাচ্ছো না।

—আরে না-না। সাইকেলের জন্যে নয়। তাহ'লে তোমাকে সব কথা খুলে বলি শোনো। আমাদের বাড়ির এই মূর্তি চুরি এবং ডাকাতির ব্যাপারে আমি ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেক কিছু আবিস্কার করে ফেলেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি দুস্কৃতকারীরা পাচার করতে পারে নি। ঐ সাইকেল নিয়ে আমি যে দিন রাত টো-টো করে ঘুরে বেড়াতাম, তা ছেলে খেলা করতে নয়। আসলে আমি ঐ মূর্তি উদ্ধারের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যাক, এখন এসব কথা বলার মতো সময় নেই। পরে সব বলব। এখন বলো যাবে কি না ?

—যাবো। নিশ্চয়ই যাবো! কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না এত রাতে তুমি টের পেলে কি করে যে ওরা ওখানে ঘোরাঘুরি করছে ?

—ওরা প্রায়ই আসে, তবে কখন আসে তা জানতাম না। কারণ বাগানের ভেতরে যেখানে সেখানে সিগারেটের খোল, দেশলাই বাক্স ইত্যাদি দেখতে পাই আমি। তাতেই বুঝতে পারি এক বা একাধিক ব্যক্তির আসা যাওয়া আছে এখানে। আজ তোমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি ছাদে উঠে যখন বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম আমার সাইকেলটা কেউ লুকিয়ে রাখার পর নিয়ে পালাচ্ছে কিনা তখনই ঐ আলো আমি দেখতে পাই। আমি একাই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল। মনে হ'ল তুমি তো আছো।

তোমাকে ডাকলে নিশ্চয়ই তুমি ডাকে সাড়া দেবে এবং আমার সঙ্গে যাবে।

—আমি যাবো। চলো আর একটুও দেরি কোর না। এক্ষুনি চলো।

ওরা তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।

বাইরে বেরনোর দরজার পাশে ওর মেসোর রেখে যাওয়া সেই লোহার ডাণ্ডাটা ছিল দেখে চন্দন সেটা হাতে নিল। তারপর দরজার খিল খুলে দুজনে মিলে শুরু করল ওদের নৈশ অভিযান। খুব সন্তর্পণে, পা টিপে-টিপে চলল ওরা। অপূর্ব জ্যোছনালোকে এই দুই ফুট ফুটে কিশোর কিশোরাকে যেন আলোকের দূত বলে মনে হ'ল।

যেতে যেতে মালা বলল—চন্দনদা, তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছিলে, না?

—কেন?

—বাঃ রে। আমি যে তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতাম না। তোমাকে 'নেকু-নেকু' বলে রাগাতাম। তোমার বই চুরি করে এনে আমার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

চন্দন হেসে বলল—প্রথমে সত্যিই খুব রেগে গিয়েছিলাম। পরে যখন বুঝলাম তোমার ওপর রাগ করা উচিত নয়, তুমি এমন এক মেয়ে যে তোমার প্রকৃতিই এইরকম তখন থেকে আর রাগ করিনি।

—আসলে তোমাকে না আমার খুব ভালো লেগে গিয়েছিল! তোমাকে দেখেই বুঝেছিলাম তোমার মতো সহজ সরল ভালো ছেলে আর হয় না। তুমি এখনকার ছেলেদের মতো নও। তোমাকে রাগালে তুমি রাগবে। কিন্তু কিছু বলবে না। তাই তোমাকে একটু রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখছিলাম।

চন্দন বলল -ওরে দুষ্টু মেয়ে, তুমি তাহলে মজা করবার জন্যে এই সব করেছিলে?

—হ্যাঁ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি চন্দনদা।

—ক্ষমা করলাম। তবে জেনে রেখো আমারও তোমার সঙ্গে ভাব জমাবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। আমার খুব ইচ্ছে করত তোমার সঙ্গে চারিদিকে বনে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে।

—বেশ তো এবার ঘোরো না কত ঘুরবে। আমি তোমাকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবো।

—ঠিক আছে, আর কোন কথা নয়। এবার মুখ বুজে চুপ চাপ চলো। বলে বড়-বড় গাছের গুঁড়ির আড়ালে ছায়ায় ছায়ায় সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে ওরা এগিয়ে চলল।

ওরা যখন সেই ঘন গাছপালার আড়ালে বাগানের অর্ধ পথে তখন হঠাৎই একটা টর্চের আলো ওদের ওপর পড়েই নিভে গেল। আর তার পরেই মনে হ'ল কেউ বা কারা যেন ছুটে পালাল সেখান থেকে।

চন্দন ও মালাও ছুটল।

মালা চেঁচাতে লাগল—চোর-চোর! জেঠু তাড়াতাড়ি এসো। ভাস্করমামা, তুমি ঐ পাশ দিয়ে যাও। চন্দনদা, দারোগাবাবুকে বলো গেটের দিকে তাড়া করতে। যাও শিগরির যাও।

চন্দন তো হত চকিত। কোথায় মেসো, কোথায় ভাস্করমামা আর কোথায়ই বা দারোগাবাবু! মালার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? একটুক্ষণ ছুটে ছোটা থামিয়ে মালা মিষ্টি করে তাকাল চন্দনের দিকে। তারপর এক চোখ টিপে হেসে বলল—ঢপ দিলাম! নাহলে আমাদের দু'জনকে ছোট দেখে যদি ওরা তাড়া করে?

চন্দন বলল—তোমার এত বুদ্ধি মালা?

—এরকম না হলে গোয়েন্দাগিরি করব কি করে? ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই। দেখো না দু'দিনে তোমাকেও আমি তৈরী করে নেব!

এখানে বাগানটা খুবই ঘন! তবুও মালা আর চন্দন দু'জনে মিলে চারিদিক তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগল কোথাও কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে না। কেউ কোথাও নেই। কোথাও কিছু নেই। আশ্চর্য।

চন্দন বলল—পালিয়েছে ব্যাটারা।

মালা বলল—পালাবে কোথায়? চারিদিকে পাঁচিল আর

পাঁচিলের গায়ে-গায়ে কাঁটা ,ঝোপ। ওরা ঠিক এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। দারোগাবাবু তো বলেইছেন কাউকে দেখতে পেলেই শিস্ দিতে। তাহলেই উনি ছুটে আসবেন।

ওরা এই ভাবে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। দেখল এইখানে পাঁচিলের একাংশ সামান্য ধ্বসে গেছে। খুবই সম্প্রতি বলে মনে হ'ল। অর্থাৎ বদমাইস লোকগুলো এইখান দিয়েই ওদের পালাবার পথ তৈরী করে রেখেছে।

মালা বলল—বুঝেছি। এই তোমাদের পালাবার পথ।

চন্দন বলল—কিন্তু মালা, এখান দিয়ে সাইকেল পাচার করবে কি করে?

ওরা তবুও পাঁচিলের কাছে এসে দেখল এখান দিয়ে পালানোও খুব একটা সহজ সাধ্য নয়। তবুও শয়তানের অসাধ্য তো কিছু নেই।

চন্দন বলল—লোকগুলো সত্যিই পালিয়েছে তো? নাকি গাছে পালায় উঠে লুকিয়ে বসে আছে?

—কে জানে? নেই যখন, তখন চলে যাই চলো।

ওরা বাগানের সোজা পথ ধরে বেশ কিছুটা ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে এলো। তারপর এক জায়গায় ঘন ঘাসের গালিচার ওপর বসে পড়ল।

মালা বলল—কি চমৎকার পরিবেশ এখানকার, না?

চন্দন বলল—সত্যি, তোমাদের এই বাগানটা দেখার পর মনে হয় না স্বর্গেও কখনো বেড়াতে যাই। ফুলের গন্ধে বুক যেন ভরে উঠেছে। আর এই অপুর্ব জ্যোছনা রাত। মনে হয় এখানকার এই ফুলবনে যেন সারারাত ধরে ঘুরে বেড়াই।

—আমারও খুব ইচ্ছে করে, তবে কি যেন চন্দনদা, সাহস আমার অফুরন্ত হলেও আমি একা তো। এখন না হয় তুমি এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছ, কিন্তু এতদিন তো একাই ছিলাম। মাঝে-মধ্যে রাত্রি বেলাও এই বাগানে আমি একা এসেছি। তবে খুব ভয় করত।

—রাত্রে একা এসেছো? কেন?

—বললাম না, আমাদের বাড়িতে যে সেই ভয়াবহ ডাকাতিটা হয়ে গেল, তারপর যখন আমি মা-বাবার সঙ্গে এখানে আসি তখন আমি নিজেই চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকি কোথাও কোন সূত্র পাই কিনা। একদিন হঠাৎ বাগানে ঘাসের ওপর ঠাকুরের মোহন বাঁশিটি আমি কুড়িয়ে পাই…।

—তারপর ?

—কেউ জানে না। কাউকে বলি নি। ওটা এখনো আমার জিম্মাতেই আছে।

—ভুল করলে মালা, এই কথাটা তোমার মেসোকে জানানো উচিত ছিল। উনি তাহলে পুলিশকে জানাতে পারতেন ব্যাপারটা।

মালা এবার একটু রাগত স্বরে বলল—কিচ্ছু হবে না তোমার দ্বারা। এই তাহ'লে তুমি 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' পড়ো ? চন্দনদা, আমি ধাপে-ধাপে অনেক এগিয়ে গেছি। ঐ মূর্তিকে উদ্ধার পুলিশে নয় আমিই করব।

—সে কি ! এত তোমার মনের জোর ?

—হ্যাঁ। তাহ'লে মালা, আমিও তোমার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি। কেননা এই রকম একটা কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, এ আমার বহুদিনের সখ। 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র বাবলুর মতো আমিও একজন হতে চাই।

—আমি জানি। তোমার মা, কাকীমার কাছে গল্প করছিলেন আমি শুনেছি। তুমি নাকি বাইরে বেরোলে ছুরি, লাইলনের দড়ি, টর্চ এইসব সঙ্গে রাখো ? ভাস্করমামা বলছিল তুমি নাকি ফেয়ারলি প্লেসের বুকিং অফিসে একজনের হাত মুচড়ে দিয়েছিলে ?

—ও বাবা, আমার সম্বন্ধে এত খবরও তুমি রেখেছো ? অথচ এমন ভান দেখাতে যেন আমাকে দেখলে তুমি জ্বলে যাও ?

এমন সময় হঠাৎ একটা কর্কশ চিৎকারে চমকে উঠল দু'জনেই।

চন্দন ভয়ে নীল হয়ে গেল। মালা সস্নেহে ওর বুকে হাত বুলিয়ে বলল—ভয় নেই। ওটা প্যাঁচা ; হয়তো কাল প্যাঁচা হবে।

একটুক্ষণ চুপ-চাপ থাকার পর মালা আবার বলল—সাইকেলটা হারিয়ে আমার কত ক্ষতি হল তা জানো ? নন্দন পাহাড়ের পথে এক

দিন পাহাড়ে ওঠার মুখে পথের ধারে কুড়িয়ে পাই ঠাকুমার গোপালকে। পা—ভাঙা অবস্থায়। তারপর থেকে রোজ দু'বেলা যাই। পাহাড় টাকে চষে ফেলি।

—সেকি!

—সাইকেলটা ছিল বলেই সম্ভব হয়েছিল। দিদা বেনারস থেকে পাথরের ঐ নাড়ুগোপাল কিনে এনেছিলেন। একটা পেতলের গনেশ, লক্ষ্মী ঠাকুর আর নাড়ুগোপাল ছোট একটি সিংহাসনে বসানো থাকত। ওরা ঝোঁকের মাথায় সেগুলোকেও নিয়ে পালাবার সময় অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে যেখানে-সেখানে ফেলতে-ফেলতে যায়।

—রূপোর বাঁশীটা তো অপ্রয়োজনীয় নয়। ওটার তো দাম আছে?

—ওটা আসলে পড়ে যায়। অন্ধকারে ছুটে পালাবার সময় পড়ে যায় ওটা। ওরা সোজা পথে না গিয়ে বাগানের পাঁচিল টপকে উল্টো পথে চলে যায়।

—পাঁচিল কি করে টপকালো?

—আগে থেকে ব্যবস্থা করে রেখেছিল নিশ্চয়ই। এক দল পাঁচিল টপকে যায়। অন্য দল সামনের গেট দিয়ে। অর্থাৎ দু'ভাগ হয়ে। তাহলে পুলিশের হাতে এক দল ধরা পড়লে অন্য দল বেঁচে যাবে। প্রথমেই ওরা চলে যায় নন্দন পাহাড়ের নির্জনতায়। তারপর···তারপর যে কোথায় যায় সেটাই খুঁজে বার করতে হবে আমাদের।

—তোমার কি মনে হয় কাছাকাছিই কোথাও আছে মূর্তিটা?

—হতে পারে। একদিন ত্রিকূট বেড়াতে গেছি, ওখানে কাকাহিগড়ের সাধুর সঙ্গে দেখা। কি ভীষণ দর্শন চেহারা। আমাকে আড় চোখে একবার দেখে নিয়ে একজনকে ফিস ফিস করে কি যেন বললেন।

—যাকে বলল সে কে?

—সে ঐখানেই আশ্রমে থাকে।

—তুমি কি করে জানলে যে ঐ সাধুই কাকাহিগড়ের সাধুবাবা?

—পরে একদিন সাধুবাবা নন্দন পাহাড়ে গিয়েছিলেন। ঐখানে

কমলু নামে আমার এক বান্ধবী আছে। সে বলল। সে-ই বলেছে ঐ সাধুবাবার কথা। কমলু মেয়েটা না খুব ভালো। আর কি সুন্দর দেখতে। ওর চোখ দুটো দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে চন্দনদা। চোখের পাতা ফেলতে পারবে না। আমি ওর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো। ওর মুখে আমি অনেক কথা শুনেছি। ও আমায় কয়েকটা লোককে চিনিয়ে দিয়েছে। ও বলেছে আমাদের বাড়িতে যারা ডাকাতি করেছে, তাদের কয়েকজনকে ও নাকি চেনে।

—বলো কি ?

—ঐ জন্যেই তো সকাল-সন্ধ্যে সব সময় আমি ওর কাছে যাই। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব বলে কেউ আমাকে সন্দেহও করে না। ওকে আমি তোমার কথাও বলেছি।

চন্দন উৎসাহ নিয়ে বলল—কি বলেছো আমার কথা ?

—বলেছি আমার এক দাদা এসেছে কলকাতা থেকে। একদিন দাদাকে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

—সত্যি ?

—সত্যি। চলো না ভোরবেলা তোমাকে নিয়ে যাই কমলুর কাছে। ও-ই বলবে সত্যি কিনা।

চন্দন হেসে বলল—আচ্ছা মালা, আমি যদি তোমার ওপর রাগ করতাম। তোমার সঙ্গে না যেতাম ?

—এঃ, তা তুমি পারতেই না। তোমার চোখ দেখেই আমি বুঝে ছিলাম তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাও। তাছাড়া আমাকে এড়ানো বড় কঠিন। বুঝলে তো ? শুধু তুমি কেন, আমার সুন্দর চেহারার জন্য সবাই আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

চন্দন অবাক। নিজের চেহারা সুন্দর সেটাও কোন মেয়ে নিজে থেকে বলে ? পাগলি নাকি ? বলল—তোমার মতো মেয়ে সত্যিই হয় না মালা। কিন্তু তুমি অত ভোরে অন্ধকার থাকতে যাও কেন ? সকালে দিনের আলোয় যেতে পারো না ?

—না। অত ভোরে কেন যাই জানো ? ওখানে ভোরে

মঙ্গলারতির সময় আমি আর কমলু ঘণ্টা বাজাই। আবার সন্ধ্যেবেলাও যখন আরতি হয়, তখনও ঘণ্টা বাজাই আমরা। ওখানকার পাণ্ডা ঠাকুর কমলুর বাবা হন। আমাকে মেয়ের মতো ভালবাসেন। আর কমলু? সে আমার বান্ধবী হলেও ঠিক যেন মা'র পেটের বোন।

ওরা বাগানের নির্জনে ঘাসের ওপর বসে যখন সেই অপূর্ব জ্যোছনা-লোকে কথা বার্তা বলছিল তখন হঠাৎই চন্দনের নজর পড়ল দুটো কালো ছায়া যেন ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

মালা অন্যমনস্ক ছিল। তাই সে ঠিক বুঝতে পারে নি। কিন্তু চন্দন বুঝল পিছন দিক থেকে কেউ যেন ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

মালা বলল—কি হ'ল চুপ করে গেলে কেন চন্দনদা?

চন্দন চোখের ইশারায় সেই ছায়া দুটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল—লুক দ্যাট।

মালা দেখল।

চাঁদ পিছনের দিকে বলেই লোক দুটির ছায়া এত বড় আকারে পড়েছে। ওরা নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে থাবা বাড়িয়ে এই দুই কিশোর কিশোরীকে গ্রাস করবার জন্য। হঠাৎ মালা চেঁচিয়ে উঠল—চন্দনদা!

চন্দন দেখল একটি ছায়া মূর্তি মালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মালাকে তুলে নিয়েছে। আর একটি যেই না ওর দিকে এগোতে যাবে ও অমনি ওর হাতে রাখা সেই লোহার রড দিয়ে সজোরে মারল লোকটার পায়ে।

লোকটা মুখ থুবড়ে যন্ত্রণায় ককিয়ে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। আর একজন যে মালাকে শূন্যে তুলে নিয়েছিল এক সময় সেও বিকট একটা চিৎকার করে উঠল। মালা দু'হাতের নখ দিয়ে তার চোখ কানা করে দিয়েছে একেবারে!

চন্দন তখন বেপরোয়া। দুটো লোককেই ধরে তখন সে কি দারুণ ডাণ্ডা পেটা। রামে রাম, রামে দুই, রামে তিন, রামে চার। কি মার! কি মার। মারের চোটে ভুবন অন্ধকার করে দিল তখন! কিন্তু ওরা ভেবে পেল না নিশি রাতের এই আগন্তুকরা ওদের দু'জনকে



অপহরণ বা আক্রমণ করতে এলো কেন?

ইতিমধ্যে ওদের চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এসেছে। সুনন্দবাবু, নিরুপমবাবু, ভাস্করমামা, বনমালি সবাই। তারপর এসে দেখেন এই রক্তা-রক্তি কাণ্ড!

সবাই জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি?

মালা আর চন্দন সব কথা খুলে বলল।

নিরুপমবাবু বললেন—কিন্তু তোমরা যে একেবারে শেষ করে ফেলেছ লোক দুটোকে। এখন থানা পুলিশ করতে গেলে ব্যাপারটা অন্যদিকে গড়িয়ে যাবে। একেবারে হাফ মার্ডার।

মালা বলল—তা বললে হয়? পুলিশে খবর তো দিতেই হবে। আমাদের বাড়ির মূর্তি চুরি এবং ডাকাতির ব্যাপারে এরা নিশ্চয়ই ছিল। নাহলে আমাদের আক্রমণ করল কেন? পুলিশের রুলের গুঁতো খেলে বাপ্ বাপ্ করে বলতে পথ পাবে না।

সুনন্দবাবু লোক দুটোকে জেরা করলেন—কি নাম তোমাদের?

লোক দুটি কোন উত্তর দিল না!

—তোমাদের যা জিজ্ঞেস করব যদি সঠিক বলো তো পুলিশে দেবো না।

লোক দুটি নিরুত্তর।

মালা বলল—সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। ধরে বেধড়ক মার দিতে পারলে ঠিক বলবে। বলেই লোহার রডটা নিয়ে একজনের পায়ের গাঁটে দড়াম করে মারতেই চিৎকার করে উঠল লোকটা।

মালা বলল—বল এবার, আমাদের নিয়ে পালাবার মতলব করেছিলি কেন?

লোকটি বলল—নেহি। ভাগ্নে কা মতলব নেহি থা।

—তবে? কোন মতলব ছিল? তোদের সঙ্গে তো আরো লোক জন ছিল। তারা কোথায়?

—ও লোক নিকাল গয়া।

—তোরা এখানে কি করছিলি?

—ভাঙ্‌খানেকে লিয়ে আয়া থা।

—ভাঙ্‌ খেতে এসেছিলি ? এই কথাটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ? আমাদের বাড়িতে তোরাই ডাকাতি করতে এসেছিলি।

—হাম লোক নেহি থা।

ভাস্করমামা এতক্ষণে একজনের পেটে একটা লাথি কষিয়ে বলল—তো কোন লোক ছিল বল ! চোরে-চোরে তোরা সব মাসতুতো ভাই।

মালা বলল—তাহলে তোরা নিশ্চয়ই আমার সাইকেল চুরি করতে এসেছিলি ?

—নেহি। হামলোক চোর নেহি।

—তাহ'লে এত রাতে বাগানে কি করতে এসেছিলি বল ? কেন আমাদের আক্রমণ করেছিলি ?

এ কথার আর কোন উত্তর নেই।

হঠাৎ বাগানের ভেতর থেকে দুম দাম বোমা ফাটার শব্দ শোনা যেতে লাগল।

নিরুপমবাবু বললেন—আর এখানে থাকা ঠিক নয়। চলো পালাই ! ওদের লোককে ওরা তুলে নিয়ে যাক।

ওরা সবাই তখন প্রায় ছুটে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। সুনন্দবাবু ও নিরুপমবাবু ছাদে উঠে লুকিয়ে দেখতে লাগলেন মালার সাইকেলে চেপে একজন লোক চলে গেল বাগানের বাইরে। জনা চারেক লোক আহত দুটিকে তুলে নিয়ে গেল ! আর শেষজন করল কি সবাই চলে গেলে সদর দরজার ওপর একটি বোমা ছুঁড়ে ছুটে পালাল সেখান থেকে।

প্রথমে 'বুম' করে একটা শব্দ। তারপর সব যেন ঝন ঝনিয়ে কেঁপে উঠল একবার। সুনন্দবাবু ও নিরুপম নেমে এলেন ছাদ থেকে। রূপা মাসী বলল—মৌচাকে ঢিল পড়েছে এবার। কি যে হবে ভগবান জানেন। তবে খুব সাবধানে চলা-ফেরা করতে হবে এবার থেকে।

নিরুপমবাবু বললেন—এবার তো দেখছি রাস্তায় ঘাটে বেরুনো দায় হয়ে উঠবে।

সুনন্দবাবু বললেন—কাজটা খুবই খারাপ করে ফেলল ছেলেমেয়ে দুটো। এখন যত রাগ না এদের ওপর পড়ে।

দেবযানী বললেন—আমার বাবা ভয় করছে। তুমি কালই সকালে চলে চলো, পালাই এখান থেকে। আর দরকার নেই দেওঘর বেরিয়ে। খুব হয়েছে।

মালা আর চন্দন চুপ। কাজটা যদিও ভালো হয়নি তবুও লোক দুটোকে ঐরকম ঘায়েল করতে না পারলে তো ওদের দু'জনকে চুরি করে নিয়েই পালাত ওরা।

ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটে উঠছে। পাখির কল কাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছে চারিদিক।





গত রাত্রের ঐ ঘটনার পর আর ভোরে বেরনো যায় না। তাই মালা ও চন্দন যে যার ঘরে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠল। সকালে জলযোগের পর মালা রূপা মাসীকে বলল—চন্দনদাকে নিয়ে একটু মন্দির থেকে ঘুরে আসব কাকিমা ?

নিরুপমবাবু বললেন—না। একদম ঘর থেকে বেরবে না। আজ থেকে বেরিয়েছো কি মরেছো। তোমরা কি ভেবেছো ওরা এই মারের বদলা নেবে না ?

সুনন্দবাবু বললেন—কথাটা তুমি যা বলেছ তা ঠিক। তবে সে ভয় করলে তো এখুনি আমাদের সবাইকে এখানকার পাট তুলে দিতে হয়। তা যখন সম্ভব নয় তখন কি হবে অযথা ভয় পেয়ে ?

চন্দন বলল—ঠিক! তুমি ঠিক কথাই বলেছো বাবা; ওরা আমাদের অপহরণ করবার ধান্দায় ছিল তাই মোক্ষম দাওয়াই দিয়েছি ওদের। আবার এলে আবার পেটাবো।

দেবযানী বললেন—ভারী তো বীরপুরুষ !

মালা বলল—বীরপুরুষই তো। ঐ রকম নৃসিংহ অবতারের মতো চেহারা যে লোক দুটোর তাদের আমরা কি অবস্থা করে ছেড়েছি বলুন তো !

চন্দন বলল—আমি যাবো মা, মালার সঙ্গে ?

দেবযানী বললেন—চল তবে আমিও যাই।

রূপা মাসী বললেন—সেই ভালো। তুইও যা দিদি। ছোড়দা-কেও সঙ্গে নিয়ে যা।

মালা বলল—কে ভাস্করমামা ? উনি অনেক আগেই বেরিয়ে গেছেন।

যাই হোক! দেবযানী মালা ও চন্দন মন্দির দেখতে চলল। বাড়ি থেকে বেরোতেই একটা সাইকেল রিক্সা পেয়ে গেল ওরা। সেই রিক্সায় চেপে একেবারে শিবগঙ্গার সামনে এসে নামল। তারপর পায়ে হেঁটে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল মন্দিরের দিকে।

আবার সেই পাণ্ডার উপদ্রব!

দু'একজনকে শংকর পাণ্ডার নাম বলতেই সরে পড়ল তারা। কিন্তু শেষকালে এমন একজন এসে হাজির হ'ল যাকে আর এড়ানো গেল না। বলল—আমি শংকর পাণ্ডারই লোক মা! শংকর এখন এখানে নেই। ও গেছে বেগুসরাইতে গান বাজনা করতে। আপনাদের পূজা পাঠ আমিই করিয়ে দেবো।

দেবযানী বললেন—কিন্তু বাবা আমি তো এখন স্নান টান কিছু করিনি।

—তাতে কি হয়েছে? এই শিবগঙ্গার জল মাথায় নিন। তাহ'লেই হবে। বলুন কত টাকার পূজো দেবো?

—দশটা টাকা আছে। এতেই যা হয় করে দাও।

পাণ্ডা তাতেই খুসি। বলল—এতেই হবে। যান শিবগঙ্গার জল মাথায় নিয়ে আসুন। তারপর চলুন আমার সঙ্গে।

দেবযানী তাই করলেন। মালা চন্দনও জলস্পর্শ করল। তারপর চলল পাণ্ডার পিছু পিছু।

পাণ্ডাটি বয়সে প্রবীণ। এবং জ্ঞানেও অনেক কিছু। যেতে-যেতে বলল—মা, এই দেওঘরের বাবা বৈদ্যনাথ বড় যা তা দেবতা নন। বাবার অনুগ্রহে এই মহাতীর্থে কারো মৃত্যু হলে যদি সে মহাপাপীও হয় তবু তাকে এই সংসারে আর ফিরে আসতে হয় না। এবং দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েও যদি কেউ এই তীর্থে না আসে, তবে তার জন্মই বৃথা। মানুষের জীবনের সর্বপাপ তীর্থ দর্শনে ক্ষয়হয়। তীর্থের পাপ নষ্ট হয় কাশী দর্শনে। কিন্তু কাশীতে বসে কোন পাপ করলে সেই পাপ সদ্য বিনাশিত হয় বৈদ্যনাথ দর্শন করলে।

দেবযানী বললেন—বলেন কি?

—হ্যাঁ মা, এসব আমার কথা নয়। শাস্ত্রের কথা।

চন্দন বলল—আপনি খুব ভালো বাংলা বলতে পারেন তো?

—কেন পারব না? এক সময় এ দেশ তো বাংলাতেই ছিল। তাছাড়া আমি মিথিলার লোক। আর এখানে বাঙালি যাত্রীরও অভাব নেই। কাজেই ভালো বাংলা শিখে গেছি। তবে লিখতে বা পড়তে ভালো পারি না। আরো শুনুন, এখানকার জল গঙ্গাজলের মতো পবিত্র এবং মাটি কাঞ্চনের মতো মূল্যবান। আর এর মাহাত্ম্য শুনবেন? পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে আছে—

ত্রেতাযুগে লঙ্কাপতি রাবণ একবার চিন্তা করছিলেন স্বর্ণলঙ্কার পূর্ণ উন্নতি করতে হলে কৈলাসপতি মহাদেবের চির প্রসন্নতার একান্ত প্রয়োজন। এই ভেবে তিনি কৈলাস পর্বতে গমন করলেন। কৈলাসে হর পার্বতীর মধ্যে তখন কি নিয়ে যেন মনোমালিন্য হয়েছিল। পার্বতী তাই অভিমান করে বসেছিলেন। এমন সময় রাবণ কৈলাসে উপস্থিত হলে দ্বার দেশে দণ্ডায়মান নন্দী বাধা দিল রাবণকে। এবং ভেতরে যেতে নিষেধ করল। কিন্তু লঙ্কাধিপতি কখনো কারো নিষেধ শোনেন না। তাই ক্রোধে কম্পিত হয়ে নন্দীকে আক্রমণ করলেন তিনি। এবং ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নন্দন কাননে। রাবণের ভয়ে কৈলাস তখন কেঁপে উঠল। আর কৈলাস কেঁপে ওঠায় পার্বতীও ভয়ে অভিমান ভুলে মহাদেবের পায়ের কাছে সরে এলেন। মহাদেব তাড়াতাড়ি এক হাতে পার্বতীকে ধরে অপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কৈলাসকে টিপে ধরে তার কাঁপুনি থামালেন। এবং নন্দীকে আহ্বান করলেন। ততক্ষণে রাবণ শিব সমীপে উপস্থিত হয়েছেন। নন্দীও এসে দাঁড়াল একটু পরে। রাবণ বললেন, হে দেবাধিদেব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি জগৎ পিতা। আপনার কাছে প্রয়োজনে আমি যখন খুসি আসব। সেখানে নন্দী আমাকে বাধা দেবার কে? তাই রাগে আমি নন্দীকে নন্দন কাননে নিক্ষেপ করেছি। এই বলে রাবণ মহাদেবের স্তব স্তুতি করতে লাগলেন। অল্প স্তবেই সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, তোমার স্তুতিতে আমি প্রসন্ন হয়েছি রাবণ। কি বর চাও

তুমি বলো ? রাবণ বললেন, আমি আপনাকে চাই প্রভু। আমি চাই আপনি চিরকাল আমার স্বর্ণলঙ্কায় বিরাজ করুন। মহাদেব বললেন, তা তো হতে পারে না রাবণ। তবে আমি দ্বাদশ জোতির্লিঙ্গের রূপে দ্বাদশ ক্ষেত্রে বিরাজ করতে চাই। এই বলে একটি জোতির্লিঙ্গ রাবণের হাতে দিয়ে বললেন, এটি তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু সাবধান। পথে কোথাও যেন এই লিঙ্গকে তুমি নামাবে না। যদি নামাও তবে এই লিঙ্গ কিন্তু সেখানেই বরাবরের জন্য রয়ে যাবে। আর তাকে নড়াতে পারবে না। রাবণ তাতেই সম্মত হয়ে জোতির্লিঙ্গ উত্তোলন করতে গেলেন। তাই দেখে পার্বতী বললেন, হে রাবণ! আপনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আপনি আচমন না করে প্রভুর লিঙ্গ উত্তোলন করতে যাচ্ছেন কিরকম ? পার্বতীর কথায় লজ্জিত হয়ে রাবণ বললেন, অপরাধ ক্ষমা করুন দেবী। আমাকে আচমনের জন্য জল দিন। পার্বতী তখন ছল করে রাবণকে মেঘ মিশ্রিত জল দিলেন। রাবণ বুঝতে না পেরে সেই জলেই আচমন করে জোতির্লিঙ্গ কাঁধে নিয়ে রওনা হলেন লঙ্কার পথে।

দেবযানী বললেন—এগুলো মনে রাখ চন্দন। শুধু তীর্থস্থানে এলেই হয় না। সব কিছু জানতে শিখতে হয়। পুরাণের অনেক কিছুই অবাস্তব হলেও পুরাণ মিথ্যে না বুঝলি ?

মালা বলল—আমি অবশ্য এই কাহিনীটা কিছু কিছু শুনেছিলাম। তবে এত ভালো করে নয়।

কাহিনী আবার শুরু হ'ল—

এদিকে প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষসরাজ রাবণ জোতির্লিঙ্গ নিয়ে যাচ্ছেন দেখে দেবগণ প্রমাদ গণলেন। তাঁরা সকলে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন বিষ্ণুর চরণ। তাঁদের সঙ্গে পার্বতীও ছিলেন। বললেন, সর্বনাশ হয়েছে প্রভু। রাবণ শিবকে সন্তুষ্ট করে জোতির্লিঙ্গ নিয়ে লঙ্কায় যাচ্ছে। শিব শক্তি লঙ্কায় অধিষ্ঠিত হলে লঙ্কাপুরী কখনোই ধ্বংস হবে না এবং রাবণ অপরাজেয় থেকে যাবে। আপনি এক্ষুনি এর একটা বিহিত করুন। বিষ্ণু বললেন—কি বিহিত করব ? পার্বতী বললেন, যে করেই হোক রাবণের কাঁধ থেকে জোতির্লিঙ্গ নামাতে হবে। বিষ্ণু

বললেন, হ্যাঁ। এ ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না। বলেই বরুণকে ডেকে বললেন, তুমি রাবণের উদরে প্রবেশ করতে পারবে? বরুণ বললেন, পার্বতী রাবণকে মেঘ মিশ্রিত জল পান করিয়েছেন। আমি তখন থেকেই ওর পেটের ভেতর ঢুকে বসে আছি প্রভু। বিষ্ণু বললেন, ভালোই করেছো। রাবণ এখন হার্দপীঠ (দেওঘর) অতিক্রম করছে। ঐ পবিত্র ভূমিই জোতির্লিঙ্গ নামাবার উপযুক্ত স্থান। তুমি এক্ষুনি রাবণের পেটের ভেতর তোলপাড় সুরু করে দাও। তারপর আমি দেখছি। এই বলে বিষ্ণু এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরে হার্দপীঠে উপস্থিত হলেন এবং রাবণের কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধের জোতির্লিঙ্গটির বিষয়ে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। এদিকে বরুণও তাঁর খেলা সুরু করে দিয়েছেন তখন। বরুণের প্রচণ্ড প্রভাবে রাবণের প্রবল প্রস্রাবের বেগ এলো। তিনি ব্রাহ্মণ বেশী বিষ্ণুকে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমার এই জ্যোতির্লিঙ্গটি আপনি কি এক দণ্ড একটু ধরবেন? আমি তাহলে একটু প্রস্রাব করে আসি। ব্রাহ্মণ বললেন নিশ্চয়ই ধরব। দেবাধিদেব মহাদেবকে কাঁধে নেবো এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। তবে এ অতি পবিত্র ভূমি। আপনি এখানে প্রস্রাব না করে একটু দূরে গিয়ে করবেন কিন্তু। রাবণ বললেন, ঠিক আছে। তবে আপনি কিন্তু ভুলেও যেন এটি মাটিতে নামাবেন না। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই বলে রাবণ সেখান থেকে এক ক্রোশ দূরে গিয়ে প্রস্রাব করতে লাগলেন। বরুণের প্রবল প্রভাবে সেই প্রস্রাব কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। প্রস্রাব তখন নদী হয়ে ছুটতে লাগল। এই নদীই বর্তমানে কর্মনাশা। এর জলে কোন পবিত্র কর্ম হয় না। এদিকে রাবণ সরে যেতেই ব্রাহ্মণ বেশী বিষ্ণু করলেন কি সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্লিঙ্গটি নামিয়ে সেই খানেই মন্ত্রপূতঃ করে স্থাপন করলেন। বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করা মাত্রই সেই জ্যোতির্লিঙ্গ মাত্র আট আঙুল প্রমাণ বাইরে থেকে সপ্ত পাতাল ভেদ করল।

এই পর্যন্ত শুনেই দেবযানী দু'হাত জোড় করে বৈদ্যনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলো।

আবার সুরু হ'ল কাহিনী—

এদিকে প্রস্রাবের বেগ তিরোহিত হলে রাবণ ফিরে এসে যখন দেখলেন ব্রাহ্মণ নেই তখন ভয়ে বুক কেঁপে উঠল তাঁর। দেখলেন জ্যোতির্লিঙ্গ সেইখানে স্থাপিত হয়েছে। এবং ব্রাহ্মণের বদলে একজন ভীল দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। রাবণ গায়ের জোরে তখন সেই জ্যোতির্লিঙ্গটিকে উৎপাটন করতে গেলেন। এমন সময় দৈববানী হ'ল, যে এই শিবলিঙ্গকে উৎখাত করবে তার বংশ ক্ষয় হবে। দৈববানী শুনে রাবণ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে জ্যোতির্লিঙ্গের মাথায় এমন মুষ্ঠাঘাত করলেন যে মাথার খানিকটা ভেঙেই গেল। বর্তমানে বৈদ্যনাথের ভাঙা মূর্তিই দেখা যায়। যাই হোক, রাবণ সেই ভীলকে জিজ্ঞেস করলেন, কি করে কি হ'ল? ভীল সবই দেখেছিল। তাই বলল, এই জ্যোতির্লিঙ্গ স্বয়ং বিষ্ণু স্থাপন করেছেন। এর পূজো করলে সর্বকাম সিদ্ধ হবে। রাবণ তাই শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তারপর ক্ষোভে নিজের দশমুণ্ড কেটে ফেলতে উদ্যত হলে রাবণকে দেখা দিয়ে শিব বললেন, হে রাবণ আমি তো আর এখান থেকে উঠব না। তবে তুমি অকারণে কেন বিলাপ করছো? তুমি এখানেই আমার যথাযোগ্য পূজা করো। এবং হরিদ্বার থেকে গঙ্গা জল এনে আমাকে স্নান করাও। রাবণ তাই করলেন এবং সেইখানেই তীর নিক্ষেপ করে একটি কূপ খনন করে তাইতে সর্বতীর্থের জল এনে রাখলেন। এই কূপের নাম চন্দ্রকূপ। ঐ দেখুন, ঐ সেই চন্দ্রকূপ।

কথা বলতে বলতে কখন যে ওরা মন্দিরের দরজার কাছে এসে পড়েছে তা কারো খেয়াল ছিল না। এইখানে জুতো জমা দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকে চন্দ্রকূপের জল নিয়ে পূজার প্রস্তুতি করতে লাগল। শঙ্কর পাণ্ডার লোক একটি দোকান থেকে ফুল মালার ডালা নিয়ে এলো। তারপর চলল মূল মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করতে।

ওঃ সেকি প্রচণ্ড ভীড়। দেবযানী মালা ও চন্দনের থালা শক্ত করে ধরে গিয়ে চললেন। বহু কষ্টে দর্শন হ'ল। পূজাও হ'ল কষ্ট করেই।

দেবযানী ঐ দশটাকা ছাড়াও লোকটির হাতে দক্ষিণা স্বরূপ আরো পাঁচটি টাকা দিতে সে তো আরো খুসি। বলল—আপনার মতো মানুষ হয় না মা। তবে আমি এতক্ষণ যা বললাম তা আপনার শুনতে ভালো লাগল কিনা জানি না। তবু আমার কর্তব্য বলা তাই বললাম।

দেবযানী বললেন—আমার খুব ভালো লেগেছে বাবা। আপনি না বললে এসব মহিমা জানতামই না।

লোকটি বলল—ধৈর্য ধরে তাহলে আর একটু শুনুন। পুরাকালে এই পবিত্র ক্ষেত্রের কাছে একটি হ্রদের ধারে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করতেন। আর এখানকার পাহাড় জঙ্গলে বাস করত ভীলেরা। ব্রাহ্মণেরা চাষ আবাদ করতেন এবং ভীলরা গরু মোষ চরাত ও শিকার করত। ব্রাহ্মণরা চাষ আবাদ ছাড়াও রাবণেশ্বর (বৈদ্যনাথ) শিবের পূজা করতেন। আর ভীলরা পূজা করত তিনটি পাথরকে। কালক্রমে ব্রাহ্মণরা অলস হয়ে পড়লেন। তাঁরা মিথ্যাবাদী ও ব্যাভিচারী হলেন। সেই সময় ভীলদের দলপতি বিজু নামে এক যুবক, ব্রাহ্মণদের এই অনাচারে দারুণ কুপিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে প্রতিদিন সে ব্রাহ্মণদের উপাস্য দেবতা রাবণেশ্বরের মাথায় লাঠির ঘা না মেরে জলগ্রহণ করবে না।

মালা বলল—বলেন কি। ভারী সাংঘাতিক তো ?

—হ্যাঁ। প্রতিজ্ঞা করার পর সে তাই করত। একদিন সে কোন কারণে ভুলে খেতে বসে গিয়েছিল। কিন্তু যেই তার সেই কথা মনে পড়ে গেল অমনি সে খাওয়া ফেলে রেখে ছুটল লাঠি নিয়ে। যখন সে ছুটতে ছুটতে হ্রদের কাছে এসে পৌঁছেছে তখন হ্রদের ভেতর থেকে হঠাৎ এক দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হয়ে কতকটা স্বগতোক্তির মতোই বললেন, কি আশ্চর্য ; একজন আমাকে মনে রেখেছে বলে ক্ষুধা তৃষ্ণা ফেলেও আমাকে মারতে আসছে, আর আমার পূজারী ব্রাহ্মণরা আমাকে ভুলে গিয়ে এমনই ব্যাভিচারী হয়েছে যে দিনান্তে একটি ফুল বেলপাতাও আমাকে দেয় না। বিজু সেই কথা শুনতে পেয়েই সেই দিব্য-পুরুষকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলল—কে তুমি ? দিব্য পুরুষ বললেন—আমি

সেই, যাকে তুমি লাঠি দিয়ে মারতে যাচ্ছো। বিজু তৎক্ষণাৎ লাঠি ফেলে দিয়ে সেই দিব্য পুরুষকে প্রণাম করে বলল—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু। আমি ব্রাহ্মণদের প্রতি ক্রোধ বশতঃ এই কাজ করছিলাম। নাহলে আপনার প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই। দিব্য-পুরুষ বললেন, ওরা আমার পূজারী হলেও তুমিই আমার প্রধান ভক্ত। আমি তোমাকে বর দিতে চাই। কি বর চাও তুমি বলো? বিজু বলল—আমি অন্য কিছুই চাই না প্রভু, শুধু আমার নামে আপনার নাম হোক এই আমি চাই। আমার নাম বিজু। আর আপনি জগতের নাথ। দুয়ে মিলে আপনার নাম হোক বিজুনাথ। দিব্যপুরুষ তথাস্তু বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই থেকেই রাবণেশ্বর বিজুনাথ নামে খ্যাত হলেন। তারপর বিজুনাথ থেকে হ'ল বৈজুনাথ। এবং বৈজুনাথ থেকে বৈদ্যনাথ।

গল্প শুনে দেবযানী অভিভূত হয়ে পড়লেন।

মালা আর চন্দনও খুসিতে ভরে উঠল। বৈদ্যনাথের এত মাহাত্ম্য তা কে জানত?

মন্দিরের পরিবেশ অতি মনোরম। চারিদিকে মন্দির। এইসব ঘুরে দেখতে দেখতে একসময় মালা প্রশ্ন করল—আচ্ছা এই মন্দির কে তৈরী করেছিলেন?

পাণ্ডা ঠাকুর বলল—আগে তো শ্রীবিষ্ণু বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এটি তৈরী করিয়েছিলেন। তারপর কালক্রমে সেটি ধ্বংস হয়। তবে প্রাচীন মন্দিরের শিলালিপি দেখে জানা যায় যে ১৫৯৬ সালে পূরণমল্ল এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। উচ্চতা ৭২ ফুট।

চন্দন বলল—পূরণমল্ল কে?

—ইনি ছিলেন গিরিধিরাজ (গিরিডিহি) বীর বিক্রমসিংহের ৯ম বংশধর। বিক্রমসিংহ ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে গিরিডি রাজবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। পূরণের পঞ্চম বংশধর ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহানের কাছ থেকে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

এরপর অনেকক্ষণ ধরে মন্দির এলাকা ঘুরে ফিরে ওরা আবার

বাইরে এলো। বাইরে কত রকমের দোকান পাট। সবকিছু দেখতে দেখতে ওরা এগিয়ে চলল ঘড়ির মোড়ের দিকে।

দেবযানী একটা দোকান থেকে লোহা লক্করের প্রয়োজনীয় অনেক কিছু জিনিসপত্তর কিনলেন।

চন্দন বলল—মা, তোমাকে একটা রিক্সায় উঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি তাইতে চেপে সোজা বাড়ি চলে যাও। মালা আর আমি চারদিক একটু ঘুরে বেড়িয়ে তারপর যাবো। কেমন?

দেবযানী বললেন—বেশ তাই হোক। তোরা দুজনে ঘুরে বেড়া। তবে খুব বেশী দেরী করিস না যেন। আমি তাহলে ভাবব।

মালা চন্দন দুজনেই বলল—আচ্ছা।

এরপর একটা রিক্সা ডেকে দেবযানীকে বিদায় দিল ওরা।

মালা বলল—চন্দনদা, এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে একবার থানায় যাওয়া।

—থানায়! কেন?

—কাল রাতের ঘটনাটা আমার মতে একবার পুলিশকে জানানো উচিত।

—তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো। কিন্তু এ জন্যে পুলিশ আবার আমাদের কিছু বলবে না তো? কারণ আমরাই তো প্রায় হাফ মার্ডার করে বসে আছি।

—যা বলে বলবে। তবু চলো যাই।

ওরা আবার একটি রিক্সা চেপে থানায় এসে হাজির হ'ল। মালা এখানকার মেয়ে। কাজেই সব কিছুই ও চেনে। থানার দারোগাবাবুও চেনেন ওকে। তাই ওরা যেতেই হেসে বললেন—কি খবর মালাজী।

মালা বলল—আপনার কাছে আমরা অভিযোগ জানাতে এসেছি একটা ব্যাপারে।

—আবার কি হ'ল?

—আপনি তো জানেন আমাদের বাড়ির বিগ্রহ চুরির ব্যাপারটা। এবার আমার সাইকেল চুরি গেছে।

—সেকি ! কখন ?

মালা তখন সব কথা সবিস্তারে খুলে বলল। এমন কি ঐ লোক দুটোকে বেদম পেটানোর কথা পর্যন্তও।

দারোগাবাবু বললেন—ব্যস। ও আসামী পাকড় জায়েগা। আমি সব হসপিটাল খবর নিচ্ছি আর ডাক্তারদেরকেও ফোনে জানাচ্ছি। তুম দোনোনে আচ্ছা কাম কিয়া। আভি ঘর চলা যাও। বাহার মাৎ ঘুমো। যাও। বলেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

ওরা কিন্তু দারোগাবাবুর কথা মতো ঘরে ফিরল না। কেনই বা ফিরবে ? সবে তো সকাল নটা। এখনই কি কেউ ঘরে ফেরে ? ওরা দুজনে পায়ে পায়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এগিয়ে চলল।

মালা বলল—চন্দনদা, আজ দুপুরে কিন্তু তুমি ঘুমিও না। আমি তোমাকে নিয়ে নন্দন পাহাড়ে যাবো। তুমি খেয়ে দেয়ে বাগানে চলে আসবে। আমিও তাই। তারপর সবাই শুয়ে পড়লেই পালাব আমরা। কেমন ? কমলুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো। তারপর ওর কাছ থেকে আরো কিছু বিষদ জেনে নিয়ে আজকালের ভেতরেই শুরু করব আমরা কাকাহিগড় অভিযান।

এমন সময় হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেল ভাস্করমামার সঙ্গে। ভাস্করমামা তখন একটা দোকানে বসে গোগ্রাসে কচুরি খেয়ে চলেছে। এদের দুজনকে একসঙ্গে দেখেই তো কচুরি গলায় আটকা-বার উপক্রম হ'ল।

মালা বলল—ভয় নেই আমরা ভাগ বসাবো না।

চন্দন বলল—কেন বসবো না ? চলো তো, আমরাও খেতে বসি। তবে ভাস্করমামার পয়সায় খাবো না। আমার কাছে গোটা কুড়ি টাকা আছে। তাতেই চালাবো।

মালা চন্দনকে অনুসরণ করল।



দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর মালা আর চন্দন বাগানে এলো। পূর্ব পরিকল্পনা মতো ওরা এসে প্রথমে একটি গাছতলায় বসল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে বাগানের গাছের ডালে বেঁধে রাখা দোলনায় দোল খেল দুজনে।

হেমন্তের দুপুর। মিষ্টি রোদের হাসি ছড়িয়ে দুপুর গড়াতে লাগল। একসময় মালা বলল—এবার নিশ্চয়ই সবাই বিশ্রাম করছে। চলো আমরা পালাই।

চন্দন বলল—চলো।

ওরা চুপিসাড়ে বাগান থেকে বেরিয়েই আবার মন্দির মুখো হ'ল। খানিক যাবার পর একটা রিক্সা ডেকে তাইতে চাপল দুজনে। নাহলে হাঁটা পথে নন্দন পাহাড় অনেক দূর।

দেওঘর শহর এখন পূজার ছুটির যাত্রীতে ভরে আছে। চেঞ্জার-দেরও আমদানি মন্দ হয়নি। তাই শহরের একপ্রান্তে নন্দন পাহাড়ের যাত্রী সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

ওরা বেশ কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হ'ল নন্দন পাহাড়ের পাদদেশে। চন্দনের মন কিন্তু ভরল না পাহাড় দেখে। এটা কি! পাহাড় না টিলা? মালভূমির মতো খানিকটা জায়গা ছাড়া কি এটা? ভাস্করমামা ঠিকই বলেছিল, এটা আসলে উঁচু একটা মাটি ও পাথরের ঢিপি ছাড়া কিছু নয়।

যাই হোক। তবু এমন সুন্দর পরিবেশ তো কলকাতায় নেই। তাই এই উন্মুক্ত পরিবেশে মুক্ত বিহঙ্গর মতো ওরা দুজনে নানা কথায় কল কল করতে করতে এগিয়ে চলল।

একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছে ওরা ছোট-ছোট কয়েকটি মন্দির দেখতে পেল।

মালা চেঁচিয়ে ডাকল—কমলু! এ কমলু বহিন?

একটি ঘরের ভেতর থেকে উত্তর এলো—যাচ্ছি।

তারপরই মালার বয়সী ফ্রক পরা একটি গোলগাল চেহারার কিশোরী মেয়ে ছুটে এলো সেখানে।

এই কমলু।

চন্দন অবাক চোখে দেখল কমলুকে।

মালা বলল—আমার চন্দনদা।

কমলু হেসে বলল—সমঝ গিয়া। তুমনে তো মুঝে সব কুছ বতায়া। বলে চন্দনকে বলল—আপনি মালার দাদা, তাহলে আমারও দাদা।

এমন সময় খড়ম পায়ে এক বৃদ্ধ মৈথিলী ব্রাহ্মণ এগিয়ে এলেন সেখানে—এ লেড়কা কৌন হ্যায়রে কমলু?

—মালার দাদা।

—জীতে রহো বেটা। কাঁহা মকান তুমহারা?

চন্দন মালার দিকে তাকাল।

কমলু বলল—বাবা আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন আপনার বাড়ি কোথায়?

চন্দন বৃদ্ধকে প্রণাম করে বলল—কলকাতায়।

বৃদ্ধ কমলুকে বলল—ইয়ে দোনোকো থোড়া পরসাদ তো দে দো কমলু বিটিয়া।

কমলু মালা ও চন্দনকে ডেকে নিয়ে গেল লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে। তারপর একবার এদিক সেদিক দেখে নিয়ে বলল—তুমহারা সাইকিল কাঁহা?

মালা বলল—কাল রাত্রে চুরি হয়ে গেছে।

কমলু বলল—আমি জানি।

—তুমি কি করে জানলে?

—আমি সব কিছু জানি। তুমহারা সাইকিল কাল্লু নে চুরায়া।

মালা রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বলল—ও। এটা তাহলে ঐ বদমাস-

টার কাজ ?

—হ্যাঁ। আজ সবেরে ও আয়া থা। ঐ সাইকিল লে কর। তোমার সাইকেল তো আমি চিনি। যেই না বলেছি এই সাইকিল তুম কাঁহাসে চুরায়া কাল্লু? ও হাস হাস কর ভাগ গিয়া।

চন্দন ও মালাকে কমলু তখন প্রসাদ খেতে দিয়েছে। খেতে খেতে চন্দন বলল—তুমি কাল্লুকে চেনো মালা ?

—হ্যাঁ চিনি। গুণ্ডা বদমাস একটা।

কমলু বলল—এইখানকার মানুষ যত ভালো তত খারাপ। বুঝলেন তো চন্দনদাদা। এই মালাদের বাড়িতে যে বড় একটা ডাকাইতি হয়ে গেল তার মধ্যে ঐ কাল্লু ভি ছিল। ঐ দিন রাতে আমার বাবুজীর কাছে ও এসেছিল চুরি করে আনা রাধাকিষণজীর ঐ মূরত রাখনে কে লিয়ে। লেকিন আমার বাবুজী বহুৎ গোঁস্সা কিয়া। উসকো মার মারকে হটা দিয়া।

চন্দন বলল—তোমার বাবুজী তো ভুল করলেন কমলু। মূর্তিটা রেখে তো মালাদের খবর দিতে পারতেন।

কমলু বলল—না। দলে তো কাল্লু একা ছিল না। বিরজু, শ্যাম এরাও সব ছিল। এরা তো ভালো লোক নয়। যদি ওরা বাবুজীকে মেরে ফেলত ? কাল্লুর আমাকে সাদী করবার লালসা আছে। ঐ জন্মে বাবুজীকে ও কুছু বোলে না। কিন্তু বাবুজী ওর সঙ্গে আমার সাদী দেবে না, আমিও ওকে সাদী করব না।

চন্দন বলল—আচ্ছা মালা, এই কাল্লু, বিরজু, শ্যাম এদের তুমি চেনো ?

—সবাইকে চিনি—বদের ধাড়ি এক একটা।

—কাল্লুর কথা মতো এরাই যদি তোমাদের মূর্তি চুরির সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে ঐ যে লোক দুটো কাল রাতে আমাদের দুজনকে চুরি চুরি করতে আসছিল ওরা কারা ? ওদের তুমি চেনো ?

—না।

—এরা কি কাকাহিগড়ের সাধুর লোক ?

—তাও জানি না।

চন্দন এবার কমলুকে বলল—কমলু বহিন, ঐ কাকাহিগড়ের সাধু-বাবা কেমন লোক?

—কি করে জানব? তবে মূর্তি চুরির পর থেকেই তো ঐ সাধু-বাবাকে এখানে আসা যাওয়া করতে দেখছি। আর কাল্লু, বিরজু, শ্যাম এরা হয়ে উঠেছে ওর আসল চ্যালা।

মালা বলল—ঠিক আছে। চন্দনদা, আর এখানে গল্প করে লাভ নেই। এখন দেখি সাইকেলটার কোন গতি করতে পারি কিনা। কাল্লুর ডেরায় একবার আমি হানা দেবো।

—কাল্লুর ডেরা কোথায়?

—কমলু জানে।

কমলু বলল—ও তো হিঁয়াসে বহুৎ দূর পড় যায়ে গা। তুমকো হারলাঝুরি যানা পড়েগা।

—হারলাঝুরি?

—হাঁ। করমনাশা নদীকা কিনার মে।

—তুমি আমাদের নিয়ে যাবে কমলু?

কমলু যেন শিউরে উঠল—নেহি। নেহি। ও সমঝ যায়ে গা। তুম দোনো যাও।

চন্দন বলল—তাহলেও তো সেই একই ব্যাপার হবে। আজ হঠাৎ আমাদের দুজনকে হারলাঝুরিতে দেখলে ও তো বুঝেই নেবে কমলুর মুখে শুনেই আমরা এসেছি।

মালা বলল—তাও তো বটে। তবে এক কাজ করা যাক। যেন আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি এইভাবে দুজনে একটা রিক্সায় চেপে হারলাঝুরিতে গিয়ে পড়তে পারি।

—সেই ভালো।

এই বলে ওরা দুজনে নেমে এলো পাহাড় থেকে। পাহাড়ের নীচে দু' তিনটি রিক্সা যাত্রী পাবার আশায় অপেক্ষা করছিল। ওরা গিয়ে তাদেরই একজনকে ঠিক করল হারলাঝুরি দেখিয়ে আনবার জন্য। কথা

হল হারলাঝুরি দেখিয়ে রিক্সা ওদের শিব গঙ্গার কাছে ছেড়ে দেবে।

ওরা সেই রিক্সায় চেপে প্রায় ঘন্টাখানেকের মধ্যে হারলাঝুরিতে গিয়ে পৌছুল। ভারী চমৎকার জায়গা। কর্মনাশা নদীর ধারে এখানকার শিবমন্দিরের তুলনা নেই। কিন্তু মুসকিল হল এখানে কোথায় কাল্লুর বাড়ি? ওরা সন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল।

—ঐতো। ঐতো মালার সাইকেলটা। একটি গাছতলায় নিতান্ত খেলো জিনিসের মতো পড়ে আছে। কোন লোক নেই, জন নেই। শুধু মাটিতে কাত হয়ে শোয়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু কেন? কাল্লু যখন চুরি করেছে তখন হয় এটাকে ব্যবহার করবে নয় তো বেচে দেবে। কিন্তু একি রহস্য?

যাই হোক। মালা আর চন্দন টেনে আনল সাইকেলটাকে। তারপর যেই না মালা তাইতে চেপে বসতে যাবে অমনি আসপাশের পাথরের আড়াল থেকে তিন-চারজন ছিপছিপে চেহারার বড় বড় ছেলে বেরিয়ে এলো। তাদের সকলকেই মালা চিনল। তারা হল কাল্লু ও তার তিন সঙ্গী।

কাল্লু বলল—আরে মালা! আমি তোমার জন্মেই অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম তুমি আজ আসবে। ঐ জন্মেই তো সাইকেলটা নিয়ে ঐ কমলু ছুঁড়িটাকে দেখিয়ে এনেছিলাম। যা ভেবেছি তাই। ও তোমাকে বলল, আর তুমি অমনি ছুটে এলে। কিন্তু তোমার সঙ্গে এই লালটু ছেলেটাকে কখনো ঘুরতে দেখিনি তো? এ মালটি কে?

মালা রুখে দাঁড়িয়ে বলল—মুখ সামলে কথা বলবি কাল্লু। নেহী তো চপ্পল মারকে মুথ তোড় দুঙ্গা। এ মেরা দাদা হ্যায়।

—ও তো সাদীকে পহলে। উসকে বাদ তুম বহু বনেগা, এই তো?

বলার সঙ্গে সঙ্গেই মালা সাইকেলটা ঠেলে দিল কাল্লুর দিকে। আচমকা সাইকেলটার ধাক্কায় কাল্লু ছিটকে পড়ল।

ওর সঙ্গে আরো যে তিন সঙ্গী ছিল তারা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল মালার ওপর। তারপর সুরু হ'ল ধস্তাধস্তি। চন্দনও মালাকে মুক্ত করবার জন্য লাফিয়ে পড়ল তাদের ঘাড়ে। তারপর আঁচড়ে কামড়ে কিল চড় ঘুসি মেরে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল সকলকে। ইতিমধ্যে কাল্লুও উঠে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটা সক্ত মোটা লাঠি। সেই লাঠির বাড়ি চন্দনের মাথায় এক ঘা দিতেই মাথাটা কিরকম যেন ঘুরে উঠল চন্দনের। ও চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে লাগল। ও বেশ বুঝতে পারল কারা যেন পাঁজাকোলা করে ওকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর খাদে। উঃ। সে কি অসহ্য যন্ত্রণা। ধীরে-ধীরে চোখে মুখে জ্বাল পড়ে এলো। সব কিছু কেমন যেন অন্ধকার হয়ে গেল চোখের সামনে।

এদিকে মালাও শরীরের যথাশক্তি প্রয়োগ করে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু চারজনের সঙ্গে একা ও পেরে উঠবে কেন? তার ওপর চোখের সামনে চন্দনের ঐ মর্মান্তিক পরিণতি ওকে দারুণ নার্ভাস করে দিল। মনে-মনে ভয়ও পেল যথেষ্ট। যদি কোন রকমে নিজেকে অক্ষত শরীরে বাঁচিয়ে নিয়ে ও ফিরতেও পারে তাহলেও বা হবেটা কি? চন্দন কি বাঁচবে? তাছাড়া ওর মা-বাবার কাছে গিয়ে কোন মুখে ও এই নিদারুণ সংবাদটা পৌছে দেবে? ওর চোখ ফেটে যেন জল এলো।

ততক্ষণে ওর অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে কাল্লু আর ওর তিন সঙ্গী ওকে আস্টে পিস্টে বেঁধে ফেলেছে। এই সব কাজে ওরা দারুণ অভ্যস্ত। তাই এমন কায়দা করে মালাকে বাঁধল ওরা যে একটু শব্দ পর্যন্ত বের করতে পারল না।

এই অঞ্চলটা অত্যন্ত নির্জন। তাই কোন লোকজনই এগিয়ে এলো না ওদের সাহায্য করতে। অসহায় চন্দন আহত ও সজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রইল কর্মনাশার খাদে। কে বলতে পারে না যে গভীর রাতে ত্রিকূটের কোন বাঘ জল খেতে এসে ওর নরম নধর শরীরটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে যাবে না? মালা অসহায় ভাবে ভগবানকে ডাকতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল, হে ভগবান। আর যেন ওকে ঘরে

ফিরতে না হয়। কারণ চন্দনের এই অবস্থার জন্য ও-ই তো দায়ী। ওর এই রকম ক্ষতি করে চন্দনের মা বাবার সামনে ও কি করে দাঁড়াবে ?

কাল্লুর দল এবার বন্দিনী মালাকে কাঁধে নিয়ে নদী পার হল। তারপর ঘন বনের ভেতর দিয়ে নিয়ে চলল চুপিসাড়ে। ততক্ষণে সূর্য অস্ত গেছে। আঁধারের ধূসর যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে আসছে প্রকৃতির বুকে। ওরা মালার হাত পা মুখ সবই বেঁধেছে। বাঁধেনি শুধু চোখ-দুটো। মালা এখন স্থির হয়ে আছে। কেননা ও বুঝেছে এখন আর অস্থির হয়ে কোন উপায় নেই। ধীরে ধীরে দুর্বৃত্তদের অত্যাচারের কাছে ওকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে।

যাই হোক। ওরা এক সময় একটু উচ্চস্থানে উঠতে লাগল। মালা বুঝল এ জায়গাটা পাহাড়ি এলাকা। চারিদিকে পাহাড়। এই পাহাড়ের একটু উচ্চস্থানে একটি পুরনো মন্দিরের ভেতর ওরা আটকে রাখল মালাকে।

মন্দিরের জানলা দরজা সবই পুরনো। কিন্তু মজবুত। সেই ঘরে ওকে রেখে কাল্লু বলল—আজকের মতো থাকো তুমি এই ঘরে। ঐ কমলু ছুঁড়িটার সঙ্গে একবার এখনি মুলাকাত করে আসি। ওকে আমি এমন শিক্ষা দেবো যে বুঝবে ও। তারপর তোমাকে আমি সাদী করব। যদি তুমি আমাকে সাদী করতে চাও তো ভালো। নাহলে ঐ ছেলেটার মতো তোমারও আমি অবস্থা খারাপ করে দেবো।

কাল্লু চলে গেল ওর তিন সঙ্গীকে নিয়ে।

হাত পা-মুখ বাঁধা মালা একাকী সেই অন্ধকার ঘরে পড়ে রইল চুপ চাপ। জল পিপাসায় জিভ যেন শুকিয়ে আসতে লাগল। তার ওপর মশার কামড়। কি যে আছে কপালে তা কে জানে ?

ওরা চলে যাবার অনেক পরে মালা অনুভব করল কারা যেন আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। তবে কি ওরা ফিরে এসেছে এতক্ষণে ? কিন্তু না। এরই মধ্যে ওদের ফিরে আসা তো সম্ভব নয়! তাহলে ?

একটু পরেই যমদূতের মতো চেহারার দুজন লোক আলো হাতে ঐ

ঘরে ঢুকল। তারা ঐভাবে মালাকে পড়ে থাকতে দেখেই চমকে উঠল—এই কৌন হো তুম?

মালার তো মুখ বাঁধা।

একজন এসে ওকে বাঁধন মুক্ত করল।

মালা বলল—থোড়া পানি পিয়েগা।

—পানি পিয়েগা? হিঁয়া তো পানি উনি কুছ নেহি হ্যায়। ক্যা নাম হ্যায় তুমহারা? মকান কাঁহা।

—আমার নাম মালা। মকান দেওঘর।

—হিঁয়া কৌন লে আয়া?

—দো তিন বদমাস লেড়কা লে আয়া হামকো।

—সমঝ গিয়া।

মালা বলল—শুনুন, আপনারা কে তা জানি না। দয়া করে আমাকে বাঁচান। আমার এক দাদাকে ওরা মেরে কর্মনাশার খালে ফেলে দিয়ে এসেছে। তাকে উদ্ধার করুন।

ওদের একজন বলল—যারা তোমাকে নিয়ে এসেছে তাদের কাউকে তুমি পয়ছানবে?

—হ্যাঁ। হারলাঝুরির কাল্লু আর ওর দোস্তরা নিয়ে এসেছে আমাকে।

—আচ্ছা, কাল্লুনে লে আয়া তুমকো? তো ইয়ে বাত পহলে বতায়া নেহি কিঁউ? ঠিক হ্যায়। তুম ভাগো। হাম সমঝেগা উসকা সাথ।

আর একজন বলল—তুমকো হিঁয়া রাখ্‌কে ও কাঁহা গয়া?

মালা বলল—নন্দন পাহাড়ে যে পূজারী ব্রাহ্মণ আছেন, ওনার লেড়কি কমলুকে ও সাদী করবার মতলব করেছে। কিন্তু উনি রাজি হচ্ছেন না। তাই ও কমলুকে জোর করে নিয়ে আসতে গেছে। ও হয়তো কমলুকে মেরেই ফেলবে। আর জোর করে আমাকে সাদী করবে।

লোক দুটো হো হো করে হেসে উঠল। বলল—আজ সাদী কা রাত হোগা তো হমলোক রসগুল্লা খায়গা। তো তুম এক কাম করো।

আভি মাৎ যাও হিঁয়াসে। চুপ চাপ বৈঠা রহো। যব ও আদমি আয়েগা তব মার মারকে হাড্ডি তোড় দেগা উসকো। তুম দেখেগা। আউর কমলুকো ভাগাকে লে আয়গা তো উসকো লে কর তুম দোনোনে এক সাথ চলা যায়গা।

মালা বলল—তার আগে একটু জল খেতে পারলে হোত।

লোক দুজনের একজন বলল—ঠিক আছে। বৈঠো তুম। ডরো মাৎ। আমি জল আনছি। বলে চলে গেল।

আর একজন যে বসেছিল, মালা তাকে বলল—আপনারা কে তা জানি না। কিন্তু আপনারা না এসে পড়লে আমার খুব বিপদ হয়ে যেত।

লোকটি বলল—খোকি, আমরা ভালো লোক না আছি। আমরা ডাকাইতি করে খাই। ও কাল্লু বদমাস ভি হামারা সাথ থা। লেকিন—

—এখন আর নেই। এই তো?

—হাঁ। এক রাত হামলোক বহুৎ বঢ়িয়া ডাকইতি কিয়া। কমসে কম পাঁচ সাত লাখ রুপিয়াকা এক মূর্তী চুরায়া থা। তো ও মূরত কাকাহিগড় ভেজনা থা উসকো। লেকিন ও কাঁহা পর হাপিস কর দিয়া কৌন জানে। ঐদিন সে ও স্রেফ ভাগতা।

মালা অবাক হয়ে বলল—বলেন কি! মূর্তিটা একেবারে লোপাট করে দিল?

—হাঁ। আজ আমরা একটা খারাপ কাম করবার জন্যে ইখানে এসে পড়েছিলাম। তা ভালোই হোল। কাল্লুকা সাথ মোকাবিলা হো যায়েগা।

মালা বলল—আচ্ছা কাকাহিগড়ে কি আছে?

—ও সাধুবাবা আছে না? ঐ সাধুবাবা ফরেন কান্ট্রিতে মূর্তি সাপ্লাই করে ফরেন মানি কামাই করেন। হামারা হিঁয়া পর যো চিজ কা দো-দশ লাখ রুপিয়া দাম হোগা। ঐ চিজ ফরেন ভেজলে সাধুবাবা পঁচাশ লাখ কামিয়ে নেবেন।

মালা বলল—তা ঐ মূর্তিটা যে কাল্লু আপনাদের ফাঁকি দিয়ে কাকাহিগড়ের সাধুকে দেননি, তার কি কিছু প্রমাণ আছে?

—কাকাহিগড়ের সাধুর হাতে ঐ মূর্তিটা গেলে ও আমাদের দুজনের হাতে পাচার হবে। ঐ সাধুবাবা ভি তাজ্জব বনে গেছেন। কাল্লু বলছে মূর্তিটা নন্দন পাহাড়েই হাপিস হয়ে গেছে।

—কিন্তু কি করে? কমলুর বাবা অত্যন্ত ভালোমানুষ।

—নেহি। ঝা'জী আচ্ছা আদমি। ও অ্যায়সা কাম নেহি কিয়েগা। মালুম হোতা হ্যায় কাল্লু একেলা কাম করনে মাংতা।

—আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে আপনাদের কোন পার্ল্টি দল তৈরী হয়েছে?

—উঁহু। ও নেহি হো শেখতা।

—তাহলে! কাল্লু'কে ঘা কতক দিয়ে কথাটা আদায় করতে পারছেন না আপনারা?

—আরে! ও সাধুবাবা বহুৎ মার মারা উসকো।

—ওকে জানে মারছেন না কেন আপনারা?

—জানে মারলে ফায়দা কি? আমরা চারদিকে নজর রাখছি। ও মাল এইখান থেকে বাইরে যাবে তো হাতে হাতে ধরব। উসকে বাদ মজা দেখায়গা বদমাশ কো।

মালা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আপনারা কোথায় থাকেন?

—আমরা জঙ্গলে থাকি। পাহাড়ে থাকি। তা কমলুকে কাল্লু সাদী করতে চায় তো তোমাকে ইখানে নিয়ে এলো কেন?

—আমি কমলুর দোস্ত ছিলাম। আমার একটা সাইকেল ঐ কাল্লু শয়তানটা চুরি করে এনেছিল। সেই খবর পেয়ে ওর ডেরাতে আমি আর আমার দাদা যাই। সেই সময় কাল্লু আমার দাদাকে মেরে ফেলে দেয়। আর আমাকে হাত পা মুখ বেঁধে এখানে নিয়ে আসে।

—আরে বাঃ। কাল্লু'নে তুমহারা সাইকিল চুরায়া? অ্যায়সা ছোটা কাম কব সে সুরু কিয়া ও? হাম লোক অ্যায়সা কাম তো কভী নেহী কিয়েগা। ঘড়ি, আংটি, রেডিও, সাইকিল এ সব কভী নেহী

চুরায়গা। হামারা বিজনেস লাখ লাখ রুপিয়া কা।

এই সমস্ত আলোচনার পর মালার মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করতে লাগল। যা কিছু সূত্র ও অনুসন্ধান করেছে সবই যেন কিরকম পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হ'ল। যেমন, কমলুর মুখে ও শুনেছে ওদের মূর্তি চুরি যাওয়ার পর কাকাহিগড়ের সাধুবাবা নন্দন পাহাড়ে বেশি করে যাতায়াত করছেন। কিন্তু কেন? ও আরো শুনেছে কাল্লু এবং তার দলবল সাধুবাবার খুব প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছে। যদি তাই হয় তাহলে কাল্লু মূর্তিটাকে হাপিস করার পরও সাধুবাবার প্রিয় পাত্র কি ভাবে হতে পারে? এবার প্রশ্ন, এত জায়গা থাকতে কাল্লু মূর্তিটাকে ঐ নন্দন পাহাড়েই বা নিয়ে গেল কেন? মূর্তিটা তো সরাসরি কাকাহিগড়েই নিয়ে যেতে পারত। এর পরের প্রশ্ন ঐটুকু সময়ের মধ্যে মূর্তিটাকে পাহাড় থেকে হাপিস করল কে? এবার যেটা মনে আসে সেটা হ'ল ঐ অসময়ে মালা ও চন্দন হারলা ঝুরিতে যাওয়া মাত্রই যেখানে কাল্লুর দেখা পেয়ে গেল সেখানে এই লোক দুটো কাল্লুকে খুঁজে পায় না কেন? সর্বোপরি লোক দুটো মালার কাছেই বা গড় গড় করে তাদের প্রকৃত পরিচয় দিতে গেল কেন? এবং গত রাতে ওদের যে লোক দুটো খুন করতে আসছিল তারাই বা কারা? এবং কারা কিসের জন্যই বা ঐ বাগানে ঘোরা ফেরা করে? মালার চিন্তার গ্রন্থিগুলো সব যেন কেমন জট পাকিয়ে যেতে লাগল। ওর বার বারই মনে হতে লাগল এই লোক দুটোও ওকে আগাগোড়া সব বানিয়ে বানিয়ে বলছে না তো?

ইতিমধ্যে অপর লোকটি একটি বোতলে করে জল নেয়ে এলো।

তৃষ্ণার্ত মালা সেই জল ঢক ঢক করে খেয়ে নিল এক নিঃশ্বাসে। তারপর বলল—আমার দাদাকে ওরা মেরে নদীর খাদে ফেলে দিয়েছে। আপনারা একটু আসবেন আমার সঙ্গে? ধরা ধরি করে তুলে আনতাম দাদাকে।

লোক দুজন একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল—জরুর যায়েগা। লেকিন ইস্ মওকে মে কাল্লু আ যায়গা তো?

—এত তাড়াতাড়ি ও কি করে আসবে? নন্দন পাহাড় কি এখানে?

—হুঁ। ঠিক হ্যায় চলো। বলে লোক দুজন মালাকে নিয়ে সেই উচ্চস্থান থেকে ধীরে ধীরে জঙ্গলের পথ ধরে কর্মনাশা নদীর দিকে এগোতে লাগল। সামনেই কোজাগরী পূর্ণিমা বলে নির্মল আকাশে জোৎস্নার প্রভাব খুব। কাজেই চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল প্রকৃতির বুকে কোন অন্ধকার নেই। তাই পথ চলতেও অসুবিধা নেই।

ওরা ধীরে ধীরে কর্মনাশার খাদে এসে নামল। কিন্তু কই? কোথায় কে? এক জায়গায় একটু রক্তের দাগ রয়েছে। এবং এক পাটি চটি জুতো পড়ে আছে। এ ছাড়া আর কোন অস্তিত্বই কোথাও নেই। রক্তের দাগটা নদীর জলের কাছ পর্যন্ত এসেছে। অর্থাৎ এদিক থেকেই কোন বন্য জন্তু এসে নিয়ে গেছে চন্দনকে। চলে গেছে অরণ্যের বক্ষ ভেদ করে ভয়ঙ্কর ত্রিকূটের দিকে। মালা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে লুটিয়ে পড়ল পাথরের বুকে।

ওর কান্না দেখে সঙ্গের লোক দুজনেও কি রকম হয়ে গেল যেন। ওদের মনটা খুব নরম হয়ে গেল। বলল—কাঁদছ কেন খুকি? মাৎ রোনা। চলো আমরা তোমাকে দেওঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। যদিও অনেক দূর তবু ভয় নেই। এসো।

মালা কাঁদতে কাঁদতে বলল—না না না। আমি এই মুখ বাড়িতে গিয়ে কাউকে দেখাতে পারব না। তোমরা আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে চলো। নাহলে মেরে ফেলো। ওর মা-বাবার ঐ একটিই মাত্র ছেলে। ওকে না নিয়ে আমি কিছুতেই বাড়ি ফিরতে পারব না।

লোক দুজন মালার হাত ধরে তুলে দাঁড় করালো। তারপর বলল—ঠিক আছে। আও মেরা সাথ। বলে পাথরের খাঁজ ধরে ওপরে উঠে অন্ধকারে বেশ খানিকটা যাবার পর ছোট্ট একটি গ্রামে এসে পৌঁছুল ওরা।

ওদের একজন একটি বাড়ি থেকে একটি মোটরবাইক নিয়ে এসে মালাকে তাইতে বসালো। তারপর বাইকটাকে ঝড়ের গতিতে ছুটিয়ে

নিয়ে চলল দূরের পাহাড়ের দিকে।

মালা বলল—আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

—কাকাহিগড়।

—কাকাহিগড়!

—হ্যাঁ। হামারা সাধুবাবাকা পাস।

—ও আদমি তো আচ্ছা নেহী। মুঝে ডর লাগতা।

—তাহলে চলো। তোমার ঘরেই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি?

মালা বলল—না।

—তব চুপ চাপ রহো।

একটা বুলেট যেন রাতের বিভীষিকার মতো ভট্‌ভট্‌ শব্দে ছুটে চলল। এত জোরে যে তা বলবার নয়। এক এক সময় মালার মনে হ'ল ওটা এখুনি বুঝি দুর্ঘটনায় পতিত হবে। কিন্তু না! এই অসম সাহসী শক্তিমান লোকটা নির্বিঘ্নেই ওকে নিয়ে পথ চলতে লাগল। এক জায়গায় এসে বাইক থামল।

এখানে চারিদিকে শুধু পাহাড়-পাহাড় আর পাহাড়। আর কি দারুণ নির্জনতা। একসময় একটি ছোট্ট পাহাড়ের একেবারে উচ্চস্থানে একটি গুহার কাছে এসে লোকটি বলল—শোনো, আজ রাতটার মতো তুমি এখানে থাকো, কেমন? তারপর কাল সকালে এসে তোমার ব্যবস্থা করছি।

মালা বলল—সাধুবাবা কোথায়?

—উনি আছেন। এখন দেখছি তোমাকে কিছু খাবার দিতে পারি কিনা। ভুখ লাগ গিয়া না? বলে সে চলে গেল।

পাহাড়ের এই ছোট্ট গুহায় অন্ধকারে একাকী মালার খুব ভয় করতে লাগল এবার। এই কি কাকাহিগড়? কিন্তু এখানে আশ্রম কই? সাধুবাবা থাকেন কোথায়? এখানে কোন আলোও তো নেই। এই গুহায় সাপ থাকতে পারে। বাঘ ভালুক আসতে পারে।

একটু পরেই অবশ্য আলো হাতে একজন লোক এলো। লোকটিকে মালা চিনতে পারল না। তার হাতে একটি খাবারের থালা। তাইতে



শিউরে উঠে কমলু চন্দনের বুকের ওপর লতিয়ে পড়ল। (পৃঃ ১০৮)

দুখানা রুটি আর সামান্য ডাল ছিল। লোকটি বলল—খা লেও।

মালা বলল—না। আমার খিদে নেই।

—আরে মা ভবানীকি পরসাদ। জলদি খা-লো।

মালা আর দ্বিরুক্তি না করে খেয়ে নিল। তারপর বলল—জল।

লোকটি বলল—আতে হেঁ। বলে চলে গিয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই এক লোটা জল নিয়ে এলো।

মালা ঢকঢক করে সেটা খেয়ে নিল। তারপর লোকটা চলে যেতেই গুহা থেকে নামা শুরু করল সে। কিন্তু নিচে নেমেই অবাক। আরে এ তো ওর অতি পরিচিত জায়গা। এই কাকাহিগড়! এখানে তো ও বহুবার এসেছে। কিন্তু না। মালা বুঝতে পারল লোক দুজন ওকে বোকা বানিয়েছে। আসলে ওরা চুরি ডাকাতি যাই করুক। মালাকে অপহরণ করার ঝুঁকিটা নিতে চায় নি। তাই কাকাহিগড়ে না নিয়ে গিয়ে ওকে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে তপোবন পাহাড়ের এই গুহায়।

মালা তখন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ঘরে ফেরাই ঠিক বলে মনে করল। তাই প্রাণপনে দৌড় লাগাল সে। দেওঘর অনেক দূর। তবু ছুটল।

হঠাৎ ওর মুখের ওপর একটা জিপের জোরালো আলো এসে পড়ল। মালা চোখ আড়াল করে দাঁড়াতেই কে যেন খপ করে ধরে ফেলল ওকে। তারপর বলে উঠল—এই তো পেয়েছি। একা একা এখানে কি করছিলে তুমি?

মালা বলল—কে আপনি?

—তার আগে বলো সেই ছোকরা কোথায়?

মালা কেঁদে বলল—জানি না।

—জানবার দরকার নেই। একটাকে যখন পেয়েছি তখন আর একটাকেও খুঁজে বার করব। উঃ। রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছিলে তোমরা? কোন বদলোকের পাল্লায় পড়েছিলে নিশ্চয়ই?

মালা অতিকষ্টে ঘাড় নেড়ে বলল—হ্যাঁ।

—ওঠো গাড়িতে ওঠো।

পুলিশের জিপ মালাকে নিয়ে দেওঘরের দিকে এগিয়ে চলল।



পুলিশের গাড়ি এসে যখন মালাকে ওর বাসায় পৌঁছে দিল তখন মধ্যরাত। বাড়িতে এতক্ষণ কান্নার রোল উঠেছিল। এবার মালাকে ফিরে আসতে দেখে মুখে হাসি ফুটল সকলের। কিন্তু চন্দন? চন্দন কই? সে নেই কেন?

দিদা ছুটে এসে মালাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—আমি তোকে কালই রেখে আসব তোর বাবার কাছে।

দেবযানী ছুটে এসে বললেন—আমার চন্দন! তাকে কোথায় রেখে এলি মা? বল সে কোথায়?

মালা ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল।

—কি হ'ল? কিছু বল? চুপ করে আছিস কেন?

সুনন্দবাবু নির্বাক। বললেন—তোমার কোন ভয় নেই। তুমি নির্ভয়ে আমাকে সব কিছু খুলে বলো তো মা! তোমরা কোথায় গিয়েছিলে, কি করছিলে বা কি হয়েছিল?

মালা সব বলল।

শোনা মাত্রই দেবযানী সংজ্ঞাহীন হলেন।

রূপা মাসী বললেন—সন্ধ্যে হয়ে গেল তবু তোদের পাত্তা নেই দেখে জামাইবাবু আর তোর কাকু থানায় গিয়েছিলেন। গিয়েই শুনলেন তোরা নাকি কাল রাতের ঘটনা থানাতে জানিয়ে এসেছিস। তোদের কথার ভিত্তিতে পুলিশ ঐ লোক ছটোকে ধরে ফেলেছে। কিন্তু এই যে ভর ছপুরে ঐ ছেলেটাকে নিয়ে উধাও হলি তুই সেটা কি না করলেই চলছিল না? এখন কোথায় খুঁজব ছেলেটাকে?

নিরুপমবাবু বললেন—সে নেই। মালার কথা যদি সঠিক হয় তাহলে বাঘের পেটেই গেছে সে।

এমন সময় ভাস্করমামা এসে হাজির হ'ল। বলল—নাঃ। অনেক খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না ওদের। তবে এখানকার পুলিশ সম্বন্ধে আমার যা ধারণা ছিল তা পাল্টে গেল। তারপর হঠাৎ মালাকে দেখেই বলল—আরে মালা। কখন ফিরলে তোমরা ?

দিদা বললেন—তোমরা নয়, ও কালামুখি একা ফিরেছে। সে ছেলে ফেরেনি। এই পোড়া মুখ নিয়ে ও যে কেন ফিরল তা বুঝতে পারছি না। অজানা অচেনা জায়গায় শান্ত শিষ্ট ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে বেঘোরে মারলে গো মেয়েটা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

ভাস্করমামা বলল—চন্দন ফেরেনি ?

—না।

মালা একবার ভাস্করমামার মুখের দিকে তাকাল। তারপর কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

নিরুপমবাবু দরজা খুলে দিতে দু'তিন জন কনস্টেবল সহ পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকলেন। তারপর সরাসরি মালার কাছে এসে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা মা ঠিক করে বলো তো, তোমরা হারলাঝুরিতে কি জন্য গিয়েছিলে ?

মালা বলল—আমার সাইকেল উদ্ধার করতে।

—বেশ। তুমি কি করে জানলে যে তোমার সাইকেল ঐখানে আছে ?

—আমার এক বান্ধবী কমলু ওটা দেখেছে। কাল্লু নামে এক বদমাইস ছেলে ওটা চুরি করে। ওর বাড়ি হারলাঝুরিতে।

—কমলু কোথায় থাকে ?

—নন্দন পাহাড়ে।

—বুঝেছি। গুণধর ঝা'জীর মেয়ে, তাই না ?

—হ্যাঁ। কাল্লু আমার দাদাকে নদীর খাদে ফেলে দিয়ে আমাকে জঙ্গলের পুরনো মন্দিরে আটক রাখে। পরে ও কমলুকে ধরে আনতে যায়। ওকে বোধ হয় ঐ মন্দিরেই নিয়ে যাবে ওরা।

—সেকি। কই এসব কথা তখন তো তুমি গাড়িতে বললে না আমাদের? চলো চলো শিগ্‌গির চলো। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দিদা বললেন—ওকেও আবার যেতে হবে বাবা?

—হ্যাঁ মা, ও সঙ্গে থাকলে আমাদের সুবিধে হবে। কারণ ক্রীমিন্যাল ধরার চেয়েও এখন ঐ ছেলেটার ব্যাপারে একটু নিশ্চিন্ত হতে হবে। ব্যাপারটা তো রহস্যজনক। কারণ এখনো পর্যন্ত এখানে নরখাদক জন্তু জানোয়ারের অস্তিত্বের কোন খবর আমরা পাই নি। কাজেই ছেলেটা যে বাঘের পেটে গেছে এ আমরা বিশ্বাস করতে রাজি নই। আমরা কথা দিচ্ছি ছেলেটাকে যে ভাবেই হোক ফিরিয়ে আনবই। আর ঐ লোক দুটোকে গ্রেপ্তারের পর আপনাদের মূর্তি চুরির রহস্যও অনেকটা ফাঁস হয়ে এসেছে।

রূপা মাসী বলল—আর আমাদের মূর্তির দরকার নেই। দয়া করে ছেলেটাকে উদ্ধার করে ওর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিন।

পুলিশের গাড়ি মালাকে নিয়ে ঝড়ের বেগে নন্দন পাহাড়ের দিকে ছুটল। যতদূর যাওয়া যায় ততদূর যাবার পরই জিপ থামিয়ে পাহাড়ে ওঠা সুরু করল ওরা। কিন্তু ওপরে উঠেই যে দৃশ্য ওরা দেখল তা রীতিমত রোমাঞ্চকর।

মন্দির প্রঙ্গনে ঝা'জীর রক্তাক্ত মৃতদেহটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে! মনে হচ্ছে রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধের পর মৃত্যুকে বরণ কবতে বাধ্য হয়েছেন প্রবীণ পূজারী।

মালা জোরে জোরে ডাক দিল—কমলু! এ কমলু! কমলু বহিন।

কিন্তু কেউ কোথাও নেই। সাড়া দেবে কে?

পুলিশ অফিসার বললেন—ওরা তাহলে ঝা'জীকে মেরেই কমলুকে নিয়ে গেছে। মেয়েটার এখন কি হাল তা কে জানে? এদের বিরাট একটা চক্র তো।

মালা বলল—শুনুন, আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, ঐ কাকাহিগড়ের সাধুও এই পাপ চক্রের সঙ্গে জড়িত।

—কাকাহিগড়ের সাধুবাবা!

—হ্যাঁ।

—তুমে ক্যায়সে মালুম হুয়া ?

—আমি জানি। জানতে পেরেছি।

এমন সময় আরো এক ঝাঁক পুলিশ এবং একজন পুলিশ অফিসার এসে হাজির হলেন সেখানে। বললেন—কি উ স্যার! কুছ মিলা ?

প্রথম অফিসার ইঙ্গিতে পড়ে থাকা ঝা'জীর মৃতদেহটা দেখিয়ে দিলেন।

—আরে! মার্ডার। এক দম মর চুকা ?

—ওদিককার খবর কি ?

—আপনার কথা মতো ঐ লোক দুটকে বেদম পিটিয়েছি। ওরা সব কথা কবুল করেছে।

—কি বলছে ওরা ?

এর উত্তরে দ্বিতীয় অফিসার যা বললেন তা হ'ল এই, এখানে এদের তিনটি দল। এর মধ্যে কাকাহিগড়ের সাধুবাবাও আছেন। আসলে নিরুপমবাবুদের ঐ রাধাকৃষ্ণ মূর্তি এই তিন দলের কারো কাছেই নেই। এই নিয়েই এদের মধ্যে বিরোধ। তিন দলের মধ্যে কাল্লু এবং ওর তিন সঙ্গীকে নিয়ে একটি দল। একটি দলে আছে হীরুক ও ভীরুক নামে দুই শয়তান। আর একটি দল হ'ল শোভরাজ সিং এবং জগমোহনের। অর্থাৎ যে লোক দুটোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওরা বলছে নিরুপমবাবুদের ঐ অগাধ সম্পত্তি, এবং বহুমূল্য ঐ রাধাকৃষ্ণ মূর্তির প্রতি লোভ ওদের অনেকদিনই ছিল। তাই ওরা সকলেই মূর্তিটি অপহরণ করবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল অনেকদিন থেকে। কিন্তু অপহরণ করলেই তো হ'ল না। এ মূর্তি বেচবে কার কাছে ? তাছাড়া উপযুক্ত দাম না পেলে অযথা চুরি ডাকাতি করেও তো লাভ নেই। এই সময় মুঙ্গেরের ভগবানদাস জেঠিয়া এগিয়ে এলেন। ইনি একজন ইন্টারন্যাশন্যাল স্মাগলার। এরই মাধ্যমে কাজ করবার কথা ওরা স্থির করল। ভগবানদাসের নামে ওয়ারেণ্ট আছে। লোকটা তাই সাধুর ছদ্মবেশ নিয়ে কাকাহিগড়ে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। অনেক উচু মহলের

লোকের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম। তাই মুঙ্গের পুলিশ সব জেনে শুনেই আর ওকে ঘাঁটায়নি। বিশেষ করে তিনি যখন এলাকার বাইরেই চলে গেছেন তখন আর তাঁকে নিয়ে মাথা ব্যাথা কেন?

কাকাহিগড়ের এই সাধুর প্রতি এখানকার পুলিসেরও যে সন্দেহ ছিল না তা নয়। এই মূর্তিটাকে চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরও ঐ সাধুর আস্তানার দিকে দৃষ্টি পুলিশ ঠিকই রেখেছিল।

কিন্তু মুসকিল যেটা হ'ল সেটা হচ্ছে মূর্তিটা তাহলে গেল কোথায়? কাকাহিগড়ের ধারে কাছেও মূর্তির অস্তিত্ব পুলিশ পায় নি।

শোভরাজ সিং ও জগমোহনের মুখ থেকে পুলিশ যে তথ্য আবিষ্কার করেছে তা হ'ল ঐ দিনের ডাকাতির পর ঐ মূর্তিটা সাধুবাবা নিজের কাছে রাখতে চাননি। কারণ উনি জানতেন মূর্তি নিজের কাছে রাখা মানেই পুলিশের খপ্পরে পড়া। তাই কাল্লুকে দিয়ে নন্দন পাহাড়ে ঝা-জীর কাছে পাঠিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। ঝা-জী মূর্তিটা ঠাকুরের আলমারীতে লুকিয়ে রাখলে কেউই টের পেত না। এবং পরে সময় মতো পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে মূর্তিটা ওখান থেকে সরিয়ে ঝুমকায় নিয়ে গিয়ে রাখা হোত। তারপর চলে যেত যথাস্থানে।

কিন্তু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ঝা-জী কোন প্রলোভনেই রাজী হননি ও কাজ করতে। এই নিয়ে কাল্লুর সঙ্গে সে রাতে দারুণ বচসা হয়। আর সবচেয়ে আশ্চর্য সেই বচসার ফাঁকে মূর্তিটা যেন কর্পূরের মতো উধাও হয়ে যায় সেখান থেকে। তাহলে কি তৃতীয় কোন ব্যক্তি সেখানে ছিল? যদি থেকে থাকে সে কে?

এরপর দলের লোকেদের মধ্যে সুরু হয় পরস্পরের পরস্পরকে সন্দেহ করার পালা। কেউ কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারে না। এবং সবার রাগ গিয়ে পড়ে ঐ কাল্লুরই ওপর। কেননা মূর্তিটা তো ওর হাত দিয়েই গিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে চারুভিলার বাগানবাড়িটাও হয়ে ওঠে ওদের একটা ঘাঁটি। কারণ ওদের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল মূর্তিটা কাল্লু আদৌ বেশি দূরে নিয়ে যায় নি। হয়তো এই চারুভিলার বাগানেই কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছে। নন্দন

পাহাড়ে মূর্তি নিয়ে যাওয়ার পর ঝা-জী ঐ মূর্তি রাখতে রাজি না হওয়ায় সে রাতে ওরা ঐ বাগানেই কোথাও এসে মূর্তিটা লুকিয়ে রাখে অথবা হারলাঝুরিতে কাল্লুর নিজের এলাকায় বাড়ির কাছাকাছি রাখে কোথাও। তবে ঐ মূর্তি হারলাঝুরিতে নিয়ে যাওয়ার চেয়েও এই বাগানে নিয়ে আসার সুবিধেটাই বেশি।

শোভরাজ সিং এও বলেছে ঐদিন রাতে মালা ও চন্দনকে বাগানে ঘুরতে দেখে ও অনুমান করেছে মূর্তি বাগানেই আছে। এবং ঐ মেয়েটি এবং ছেলেটি নিশ্চয়ই সে খবর জানে। তাই ওরা ওদের তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওরা যে এমন মারাত্মক তা ওরা জানত না।

যাই হোক। এখানকার সব কিছু তদারকির পর দুজন কনষ্টেবলকে ঝা-জীর মৃতদেহ পাহারা দিতে বলে পুলিশ মালাকে নিয়ে চলল হারলা-ঝুরির দিকে। যেখানে কর্মনাশা নদীর খাদে চন্দনকে ওরা ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়েই আর এক বিস্ময়। ওরা দেখল নদীর বালিতে পর পর তিনটি মৃতদেহ লাইন দিয়ে সাজানো আছে। তাদের সর্বাঙ্গে নিদারুণ ক্ষত চিহ্ন। এই মৃতদেহ গুলি আর কারো নয়। কাল্লুর তিন সঙ্গীর। কাল্লু হয়তো ঐ তিন সঙ্গীকে মেরে কমলুকে নিয়ে পালিয়েছে। যাই হোক, কাল্লুকে এখন ধরতেই হবে। নাহলে কমলু উদ্ধার হবে না।

মালা সকলকে নিয়ে এরপর জঙ্গল পার হয়ে সেই পাহাড়ে পুরানো মন্দিরে গেল। কিন্তু কোথায় কে ? না কমলু না কাল্লু কারো সন্ধানই পাওয়া গেল না সেখানে।





এইবার চন্দনের কথায় আসা যাক।

জীবনে যে ছেলে কখনো বাবা মার কাছে সামান্য একটা চড়ও খায়নি তার মাথায় লাঠির ঘা পড়লে সে সহ্য করতে পারবে কেন? তাই ঐ দারুণ আঘাতে সজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল সে। মাথার একটা পাশ সামান্য কেটে অথবা ফেটে রক্তও ঝরছিল চুঁয়ে চুঁয়ে। সেই সঙ্গে রক্ত ঝরছিল নাক দিয়ে। এর ওপর ওকে নদীর বালিতে খাদের মধ্যে ফেলে দেওয়ায় গা গতরও যথেষ্ট ব্যথা হয়ে ওঠে। ওর যখন ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এলো তখন প্রথমটা খুব হক চকিয়ে গেল ও। তারপর নিজেকে বালির মধ্যে আবিস্কার করে শঙ্কিতও হল। এর পর সামনেই জল দেখে বুকে হেঁটে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে। তারপর জলে মুখ দিয়ে একটু একটু করে জল খেল। নদী বা ঝর্ণার জল কখনো এভাবে খেতে নেই জেনেও খেল। না খেয়ে উপায় নেই। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জল খেয়ে মুখ হাত ধুয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসে হাঁফ ছাড়ল ও। সর্বাঙ্গ ব্যথা। কেননা পাহাড়িয়া নদী তো। চারিদিকে বালির সঙ্গে পাথর নুড়ির ছড়া ছড়ি। তাই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য সর্বত্র আঘাত।

প্রথমেই ওর মালার কথা মনে পড়ল। কোথায় গেল মালা! দুর্বৃত্তরা কি মালাকে নিয়ে চলে গেছে? না মালা পালাতে পেরেছে আত্মরক্ষা করে? চন্দন তখন ধীরে ধীরে ডাঙার ওপর উঠে এলো। উঠে দেখল এ তো সেই জায়গা। যেখানে ওরা ওর মাথায় আঘাত করেছিল। মালার সাইকেলটা তখন পড়েছিল সেইখানে ঝোপ ঝাড়ের পাশে।

চন্দন সেটা টেনে আনল। যাক। আর কিছু হোক না হোক এখন পালিয়ে তো বাঁচা যাবে। আর মালাকে উদ্ধারের জন্য পুলিশ প্রশাসন বাড়ির লোকেরা সকলেই আছে। এমন সময়—

একি? এ কার গলা? কমলুর না? ও দেখল হারলা ঝুরির ডাঙা থেকে কাল্লু ও তার সঙ্গীরা প্রায় টানতে টানতে নিয়ে আসছে কমলুকে।

কমলু চিৎকার করছে—ছোড় দো। মুঝে ছোড় দো।

—ছেড়ে তো দেবো। তার আগে বল ঐ মূর্তিটাকে কোথায় হাপিস করিয়ে দিল তোর বাবা?

—ম্যায় কুছ নেহি জানতা।

—সব কিছু জানিস তুই। আসলে তোর বাবা আর তুই হলি পাক্কা শয়তান। না হলে চোখের পলকে ঐ মূর্তিটা হাওয়া হ'ল কি করে? আর ঐ মালা। ও লেড়কি ভি সব জানে। মূর্তিটা হাপিস হ'ল আর ও লেড়কির সঙ্গে তোর দোস্তি বাড়ল? বল শিগগির?

—আমি জানি না।

এমন সময় নদীর ওপারের জঙ্গলের ভেতর থেকে একজন ভয়ঙ্কর দর্শন লোককে ছোরা হাতে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

তাকে দেখা মাত্রই কি রকম যেন হয়ে গেল কাল্লুর দলবল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই ওর সঙ্গীরা হুপহাপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই লোকটির ওপর। শুরু হ'ল খণ্ড যুদ্ধ। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর শক্তির সঙ্গে ওরা পারবে কেন? তাই চুনো পুঁটির মতো মরতে লাগল। এলোপাথারি ছোরা চালিয়ে তিনজনকে ঘায়েল করতেই কাল্লু পিছন দিকে দৌড় লাগাল।

কিন্তু পালাবি কোথায় বাছাধন? চন্দন তখন পাণ্ডব গোয়েন্দা। একটি মাঝারি সাইজের পাথর কুড়িয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারল কাল্লুর মাথাটা লক্ষ্য করে। অব্যর্থ টিপ। বেলের মতো ফেটে গেল মাথাটা। কাল্লু মুখ থুবড়ে পড়ে গেল পথের ওপর।

চন্দন ছুটে গেল কাছে। গিয়ে সমবেদনার সুরে বলল—লেগেছে

ভাই ? আহা ! আমারও তখন এমনিই লেগেছিল। এখন বলতো আমার বোন কোথায় ?

—জানি না।

ততক্ষণে কমলু ছুটে এসেছে—আরে ! চন্দন দাদা ? মেরা বহিন কাঁহা ? মালা !

—সেই কথাই তো জিজ্ঞেস করছি ওকে। বলছে, ও জানে না।

কমলু সঙ্গে-সঙ্গে ওর চুলের বেণী থেকে একটা কাঁটা বার করে কাল্লুর একটা চোখে সজোরে গেঁথে দিল। বলল—শয়তান। তুই আমার পিতাজীকে খুন করেছিস। এখন বল মালা কোথায় ?

কাল্লু আর্তনাদ করে উঠল—আ-আ-আ।

—এখনো বল। একটা চোখ গেলে দিয়েছি। আর একটা দেবো। বল শিগগির।

—পুরানা মন্দির মে পাহাড় পর।

নদীর গর্ভে যে ভয়ঙ্কর লোকটি এতক্ষণ হত্যালীলায় মেতে উঠেছিল সে লোকটি এবার ধীরে-ধীরে উঠে এলো ওপরে। তারপর কাল্লুকে ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে বলল—তোকে আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছিলাম রে কাল্লু। সামান্য একটা সাইকেল চুরি করতে গিয়ে আর সাদীর আনন্দে কেমন ফেঁসে গেলি দেখ। আয় আমার সঙ্গে। তোর সাদী দিয়ে দেবো আজ। জয় মা কালী কি।

চন্দন আর কমলু বলল—হীরুক ভেইয়া। কাল্লুনে হামারা পিতাজীকো মার ডালা।

—ক্যা বোলা ! ঝা-জীকো মার ডালা এ কুত্তা ?

—হ্যাঁ।

—একদম নিধন হো গিয়া ?

—হ্যাঁ।

—ঠিক হ্যায়। তুম্ রোও মাৎ, যাও, ঘর চলা যাও।

—লেকিন ও মালা বহিন ?

—তুমহারা মালা বহিনকো হাম দোনোনে বাচায়া। ও কাকাহিগড়ে

চলা গিয়া ভীরুক ভাইয়া কা সাথ। যাও, তুম ঘর চলা যাও। বলে আবার নদীর জলে নেমে গেল লোকটি। অবশ্যই কাল্লুকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে।

চন্দন আর কমলু অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল পরস্পরের মুখের দিকে।

চন্দন সাইকেলটা টেনে নিয়ে কমলুকে বলল—চাপো তুমি সামনের দিকে। আমি ডবল ক্যারি করছি। তোমার বাবা যখন নেই, তখন আজ রাত্রিটার মতো আমাদের ঘরেই চলো তুমি। তারপর মেসোকে দিয়ে পুলিশে খবর দেওয়াবো।

কমলু বলল—চন্দনদা! কাকাহিগড়ের পথ চিনি। আগে চলো আমরা সেইখানেই যাই। মালাকে উদ্ধার করি। নাহ'লে ও তো ভাববে। আর থানা পুলিশ করেই বা কি হবে? কাল্লু আমার পিতাজীকে খুন করেছে। কিন্তু তুমি ওর মাথা ফাটিয়েছো, আমি চোখ কানা করেছি, আর হীরুক ভাই ওকে জ্যান্ত কবর দেবে। এইখানেই তো বদলা নেওয়া হয়ে গেল আমার।

—ঐ হীরুক ভাইটা কে?

—ও ভি ডাকু হ্যায়।

—বলো কি?

—হ্যাঁ, এরাই তো সবাই মিলে ডাকাতি করেছে মালাদের বাড়িতে। ওরা যখন নন্দন পাহাড়ে আমাদের মন্দিরের পিছনদিকে বসে সব কিছুর আলোচনা করত, আমি তখন লুকিয়ে-লুকিয়ে শুনতাম। হীরুক আর ভীরুক ভাইয়া আমাকে খুব ভালবাসে। বাবাকেও খাতির করত।

কমলুর নির্দেশিত পথ ধরে চন্দন দ্রুত সাইকেল চালনা করতে লাগল। সারা গায়ে এত ব্যথা। তবু এক অপূর্ব মনোবলে এগিয়ে চলল ওরা।

কাকাহিগড়। চারদিকে ছোট বড় পাহাড়ের সমাবেশ। ঐ তো ত্রিকূটপাহাড়ের চূড়ো দেখা যায়। কত ছোট-ছোট টিলা। টিলাগুলোর

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বড় জোর হু'বছর এগুলোর মেয়াদ। কেননা এখানে পাথর কাটার কাজ দ্রুত চলছে। চারিদিকে নুড়ি পাথর জড় অরণ্য করা। নিধনের তোড়জোরও চলছে পুরোদমে। বড় বড় গাছের কাটা ডাল পড়ে আছে যেখানে সেখানে।

ওরা এক পাশে সাইকেলটা লুকিয়ে রেখে ধীরে-ধীরে পথ চলতে লাগল, জঙ্গল আর টিলার মাঝখান দিয়ে। পথ চলার সময় চন্দন বুঝল কমলু কাঁদছে। বলল—কেঁদে কি করবি রে? যা তোর কপালে ছিল, তা হয়েই গেছে। চন্দন বড় দাদার মতো তুমির বদলে তুই বলতে লাগল কমলুকে।

—এখন আমি কি করব দাদা? আমার যে কেউ নেই।

চন্দন বলল—কে বললে তোর কেউ নেই? আমি তো আছি। আমি তোর দাদা। আমার কত বোনের সখ ছিল। তা এমন একটি বোন পেলাম, সে কি ছেড়ে দেবো বলে? কি সুন্দর দেখতে তোকে। লোককে দেখিয়ে আমার বোন বলে গর্ব করব। আমাকে রাখি পরিয়ে দিবি। ভাই ফোঁটা দিবি। আর আমি বড় হয়ে চাকরি করলে রাজপুত্তুর ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো।

—মালা বলছিল বড় হয়ে তোমাকে নাকি ও বিয়ে করবে।

—তাই নাকি? এই কথা বলেছে মেয়েটা? কি বোকা। যাকে দাদা বলে তাকে কি কেউ বিয়ে করে? মেয়েটার সত্যি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। একেবারে ছেলেমানুষ।

কমলু বললে—আচ্ছা দাদা, তুমি আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছো, কিন্তু তোমার মা বাবা আমাকে রাখবেন?

—সে দায়িত্ব আমার।

—কিন্তু আমার বাবুজী। বাবুজীর দেহান্ত হয়ে গেলে তাঁর সৎকারের কি হবে?

—সব ঠিক হয়ে যাবে। আগে মালাকে উদ্ধার করি আয়। তারপর ব্যবস্থা করব। আর আমি কথা দিলাম আজ থেকে তুই আমার কাছেই থাকবি।

এইভাবে যেতে-যেতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল সামনেরই একটি পাহাড়ের উচ্চস্থানে এক রুদ্র-মূর্তি সন্ন্যাসী ওদের দিকে তাকিয়ে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছেন। সন্ন্যাসী চোখের যেন পাতা পড়ছে না।

চন্দন ও কমলুকে দেখেই তিনি আকাশ ফাটিয়ে হাঃ হাঃ শব্দে হেসে উঠলেন। বললেন—আরে কমলু বিটিয়া, তুম হিঁয়া পর ক্যায়সে আ গিয়া, তুমহারা পিতাজী কাঁহা ?

কমলু বলল—হামারা পিতাজীকা নিধন হো গিয়া।

—আ-হা-হা-হা। হায় রে।

চন্দন বলল—সাধুবাবা! আমার বোন মালা আপনার এখানে আছে। ওকে ফিরিয়ে দিন। আমরা ওকে নিতে এসেছি।

—আরে বাঙ্গালি বাচ্ছা। তুম কৌন ?

—ঐ যে মালা, যাকে ভীরুক ভাই নিয়ে এসেছে আমি তার দাদা।

—ও। তব তুম চারুভিলা কা লেড়কা ?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে। তোমার বোন মালা আমার কাছেই আছে। এসো, এখানে এসো। ঐদিকের রাস্তাটা দিয়ে এসো।

ওরা সাধুর নির্দেশিত রাস্তটা ধরে নেমে আসতে গিয়েই দেখল, এক জায়গায় কয়েকজন বলিষ্ঠ চেহারায় লোক ওদের দিকে তাকিয়ে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের দেখেই শিউরে উঠল কমলু। চন্দনের বুকের ওপর লতিয়ে পড়ে ভয় জড়ানো কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল—চন্দনদা! পালিয়ে চলো এখান থেকে। এদের মতলব ভালো নয়। আমি এদের সবাইকে চিনি। এরা বড় সাংঘাতিক।

চন্দন বলল—তবে তাই চল। কিন্তু আমরা কি পারব এদের খপ্পর থেকে পালাতে ? আর পালিয়েই বা লাভ কি ? মালাকে তো উদ্ধার করতেই হবে।

—আমরা এখুনি গিয়ে পুলিশে খবর দেবো। নাহ'লে শুধু হাতে

হুজনে আমরা কি করে কি করব বলো? আমার বাবুজী মরে গেছে। কিন্তু এখন যদি ওরা তোমাকেও মেরে ফেলে তো আমার কে থাকবে?

চন্দন বলল—তবে আয়। খুব জোরে ছুটতে হবে কিন্তু। এই বলে ওরা দ্রুত ছুটতে লাগল।

কাকাহিগড়ের সেই সাধু চিৎকার করে উঠলেন—পাকড়ো, জলদি পাকড়ো ঐ দুটোকে।

ওরা তখন তীর বেগে ছুটেছে জ্যোস্নালোকিত কাকাহিগড়ের বন্ধুর প্রান্তরে, খানিক ছুটে যাওয়ার পরই দেখল মূর্তিমান যমের মতো হু'জন লোক ওদের সামনে ছোরা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দেখেই থেমে পড়ল ওরা।

পাশেই একটি পাহাড়ের ঢাল ছিল। সেটা দিয়ে গড় গড় করে খানিকটা গড়িয়ে নেমে এলো ওরা একটু সমতল প্রান্তরে। তারপর আবার ছুট। ছুট-ছুট-ছুট। কিন্তু আবার খানিক আসার পর দেখল এখানেও ওদের পালাবার পথ রুদ্ধ। এদিকেও হু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে ছোরা হাতে।

ইতিমধ্যে ওরা ভয়ে এমনই হতচকিত হয়ে গিয়েছিল যে সাইকেলটা কোন পথে কোনখানে রেখে এসেছিল, তাও আর মনে করতে পারল না।

হঠাৎ একসময় হু'তিনজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের হু'জনকেই পাঁজাকোলা করে তুলে নিল।

চন্দন ও কমলু আত্মরক্ষার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

ওরা ওদের নিয়ে এলো একটু সমতলে। সেখানে একটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে চন্দনকে বাঁধল। তারপর কমলুকে ছাড়া অবস্থাতে রেখেই ওরা একটু দূরে সরে গিয়ে পাহারা দিতে লাগল ওদের।

কমলু চিৎকার করতে লাগল—ছোড় দো, ছোড় দো মেরা ভাইয়া কো, শয়তান ডাকু কাঁহাকা। এমন সময় কাকাহিগড়ের সেই সাধু এসে দাঁড়ালেন সেখানে। বললেন—আরে! কমলু বিটিয়া! তু ইতনা ডরতি হ্যায় কিঁউ? মুঝে দেখ কর।

কমলু সন্ন্যাসীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলল—আমার দাদাকে

ছেড়ে দিন সাধুবাবা।

—দেগা। জরুর দেগা। তবে তুই আমাকে ঠিক করে বলতো মা ঐদিন রাতে মূর্তিটা তোর পিতাজী কোথায় লুকিয়ে ফেলেছিল ?

—সাধুবাবা। আপনার কসম খেয়ে বলছি। ঐ দিন রাতে মূর্তিটা আমার বাবা থানা পুলিশের ভয়ে রাখতে না চাইলে ঐ কাল্লু শয়তানটা ওটা নিয়ে পালিয়ে যায়।

—তারপর !

—হীরুক ভাই ও ভীরুক ভাইয়ের সাথে কাল্লুর একটা বোঝাপড়া হয়। এরপর থেকে কাল্লু রোজ এসে আমাকে বিরক্ত করতে থাকে সাদী করার জন্য। বলে আমাকে নিয়ে ও অন্য জায়গায় চলে যাবে। আর মূর্তি বেচার টাকায় ঘর সংসার করবে। বাবুজীকে ভি অনেক টাকা দেবে।

—সাচ্।

—হ্যাঁ সাধুবাবা।

—না। এটা তুই বানিয়ে বললি। সাচ্ বাত কি আছে ঠিক করে বল দেখি ? বলে চন্দনের দিকে এগিয়ে গেলেন সাধুবাবা। তারপর ওর চুলের মুঠি ধরে বললেন—এই তুই কিছু জানিস ? জেনে থাকিস তো বল।

চন্দন বলল—জানি। কমলুও জানে, আমিও জানি। আর আমার বোন মালাও জানে। আগে ওকে মুক্তি দিন। তারপর সব বলব।

—তোর বোন এখানে তো নেই। তপোবন পাহাড়ের গুহায় তাকে রাখা হয়েছিল কিন্তু পরে তাকে আর দেখছি না। হয়তো সে এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছেই গেছে।

চন্দন বলল—তাহ'লে জেনে রাখুন এখুনি পুলিশও আসছে।

—পুলিশ ! আসুক না। আমরা কাছে মন্ত্রী-কমিশনার সবাই তো আসে। বুরবাক লেড়কা। আমাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছিস তুই ? তাহলে জেনে রাখ, অনেক বড় নৌকোয় আমার দড়ি বাঁধা।

পুলিশ আমার কিচ্ছু করতে পারবে না। যদি পারত, তাহ'লে এতদিনে আমার অনেক কিছুই করত। এখন যদি বাঁচতে চাস তো ঠিক করে বল, ঐ মূর্তিটা কোথায় ?

—ঐ মূর্তিটা আমাদের বাগানেই এক জায়গায় পুঁতে রেখেছি আমরা।

—কোনখানে ?

—আমাদের নিয়ে চলো দেখিয়ে দিচ্ছি।

সাধুবাবা বললেন—ঠিক বলছিস ?

—হ্যাঁ, আমার হাত-পা খুলে দাও এবার। বড্ড লাগছে আমার।

সাধুবাবা বললেন—বেশ খুলে দিচ্ছি। তবে আজ রাতের মতো আমাদের এখানে থাকতে হবে তোদের দু'জনকে। যদি ওটা পাই তাহ'লে কাল এমনিই ছাড়া পাবি। নাহলে কিন্তু মা কালীর কাছে বলি দেবো তোদের দু'জনকেই।

—বেশ তাই দেবেন। এখন ছাড়ুন তো।

সাধুবাবা ওর বাঁধন মুক্ত করে বললেন—ঠিক কোনখানে আছে বলতো ওটা ?

—বাগানের পিছনে পাঁচিলের গায়ে যে শিরিষ গাছটা আছে সেইখানে।

সাধুবাবা দলের লোকদের বললেন—যাও। তুম সব জলদি চলা যাও হুঁয়া পর।

সাধুর লোকেরা তখনি ছুটল।

সাধু ওদের দুজনকে নিয়ে তাঁর আশ্রমের দিকে এগোতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কমলু ও চন্দন ইশারা করে নিল। তারপর চোখে-চোখে কথা বলে যেই না একটা পাথর কুড়িয়ে মারতে যাবে, অমনি সাধুবাবা খপ করে এক হাতে ধরে নিলেন কমলুকে। কিন্তু চন্দন ততক্ষণে সাধুর জটা ধরে ঝুলে পড়তেই নকল জটা খুলে এলো খস করে।

একি! এ তো ছদ্মবেশী। এতো সাধু নয়!

চন্দন বলল—কে আপনি? আপনি তো কাকহিগড়ের সাধু নন।

সাধুবাবা ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বললেন—কে আমি একটু পরে বুঝবি। শয়তান ছেলে, যদি তোর কথা মিথ্যে হয় ওরা মূর্তি না পেয়ে ফিরে আসে তাহলে আজই শেষ রাতে তোদের বলি দেবো মায়ের কাছে। এখন চল তোদের দু'জনকে মায়ের মন্দিরে রেখে আসি।

এই বলে দু'জনের হাতের নড়া ধরে টানতে টানতে সাধুবাবা ওদের নিয়ে একটা টালির চালা দেওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দিল।

আসলে হারলাঝুরিতে মাথায় ঘা খেয়ে নদীর খাদে পড়ে গিয়ে চন্দনের শরীরে শক্তি বলে আর কিছুই ছিল না। তাই সে আর বেশি রকম বাধা দিতে পারল না। তবু ওরা দু'জনে সেই বন্ধ দরজায় লাথির পর লাথি মেরেই চলল।

এক সময় ক্লান্ত হয়ে থামল দু'জনে। যে ঘরে ওরা ছিল সেই, ঘরে মিট মিট করে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। সেই প্রদীপের আলোয় ওরা দেখল, এইটাই মায়ের মন্দির। এক পাশে কয়েকটি নরমুণ্ডের করোটি রাখা আছে। তারই মাঝখানে মা-কালীর মূর্তি।

কমলু বলল—আচ্ছা চন্দনদা!

—বল।

—তুমি যে ওদের মিথ্যে করে বললে মালাদের বাগানে শিরিষ গাছের নীচে মূর্তিটা পোঁতা আছে। কিন্তু একথা তো ঠিক নয়, কাজেই ওরা যখন মূর্তি না পেয়ে ফিরে আসবে, তখন কি হবে?

—আরে বুঝলি না কেন, এই আছিলায় ওদের একটু দূরে সরিয়ে দিলাম। এর ফলে হ'ল কি ওরা মূর্তি উদ্ধার করতে গিয়ে নির্ঘাত ধরা পড়বে। কেন না মালা কি এতক্ষণে বাড়ি গিয়ে হৈ-চৈ পাকিয়ে থানা পুলিশ করেনি ভেবেছিস? আর এই সময়ের মধ্যে আমরাও এখান থেকে পালাবার কোন মতলব বার করতে পারব।

—কি করে পালাবে?

—শোন, তুই এক কাজ কর। দুটো হাত পিছনে রেখে আঙুলের ফাঁকে-ফাঁকে জুড়ে শক্ত করে দাঁড়া। আমি তোর হাতে পা দিয়ে কাঁধে উঠে ওপরের টালি ফাঁক করে পালাই। তারপর ওদিকে নেমে

দরজার শিকল খুলে তোকে নিয়ে পালাব।

কমলু বলল—বাঃ। 'তোমার বেশ বুদ্ধি তো।

—এ ছাড়া উপায় নেই রে।

চন্দনের কথা মতো কমলু তাই করল। এবং এই উপায়ে চন্দনও অনায়াসে ওর হাতে পা রেখে কাঁধে উঠল। তারপর টালি খুলে বেরিয়ে পড়ে দরজা খুলে দিতেই মুক্তি পেল কমলু।

এবার আর কোনদিকে না গিয়ে সোজা পাহাড়ি পথ দিয়ে দৌড়তে লাগল ওরা। চন্দন কমলুর একটা হাত শক্ত করে ধরে ছুটতে লাগল।

ইতিমধ্যে কি করে যেন টের পেয়ে সাধুবাবাও ছুটে এসেছেন তখন —রুখ্ যা! এ বাঙ্গালি রুখ্ যা। নেহি তো মার ডালে গা।

চন্দন ঘুরে তাকিয়ে দেখল কাকাহিগড়ের সাধুবাবা আবার সেই আগের মতো জটাজুটধারী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে 'চন্দনদা' বলে ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মালা। তারপর বাচ্ছা মেয়ের মত হাউ-হাউ করে কেঁদে বলল—তুমি বেঁচে আছো চন্দনদা! আমি তো ভেবেছিলাম মরেই গেছ। আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছো না? সামান্য একটা সাইকেলের জন্য কি কাণ্ড!

চন্দন মালাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—তোমার সাইকেল আমি উদ্ধার করেছি মালা। কিন্তু তুমি এখানে কি করে এলে?

—আমি এসেছি পথ খুঁজে। তবে একা নয়। সঙ্গে এক গাড়ি পুলিশ নিয়ে। একটু আগেই একটা দলকে রাস্তায় ধরে ফেলেছে পুলিশ। এখন বাকি শুধু ঐ যত নষ্টের গোড়া সাধুটা। ব্যাটা ভণ্ড।

—কোন সাধু! ওটা তো ছদ্মবেশী, ঐ জটা ওর পরচুলা!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—হতে পারে। তবে কাকাহিগড়ের সাধু উনিই।

মালার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গুড়ুম করে একটা শব্দ। আর সেই শব্দের সঙ্গে আর্ত চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল কমলু। চন্দন

মালাকে টেনে নিয়ে বড় একটা পাথরের খাঁজে গা আড়াল করল।

আবার একটা গুলি এসে লাগল পাথরের গায়ে।

কাকাহিগড়ের সাধু ক্ষিপ্ত হয়ে গুলি চালাচ্ছেন।

ততক্ষণে দলে-দলে পুলিশ ছুটে এসেছে সেখানে।

মালা ও চন্দন আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল কমলুর কাছে। কমলু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ওরা দু'জনে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল কমলুকে।

এদিকে পুলিশের লোকেরা হিড়-হিড় করে টেনে আনল সাধুবাবাকে।

একজন অফিসার হাতে হাতকড়া পরিয়ে বলল—তারপর ভগবান-দাসজী! আপনি এতদিন অনেক খেল দেখিয়েছেন। এইবার আপনার পালা শেষ।

সাধুবাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন—ম্যায় সর্বানন্দ গিরি হুঁ। ভগবানদাস নেহী।

চন্দন ছুটে গিয়ে সাধুর জটাটা টেনে খুলে দিয়ে বলল—এইবার বলুন আপনি কে?

সাধুবাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন—মেরা ক্যা কসুর?

—আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। শুধু প্রমাণের অভাবে এতদিন আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারছিলাম না আমরা। আপাততঃ অন্য কোন প্রমাণ না থাকলেও ছেলে-মেয়ে ধরে আটক করা এবং খুনের অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। নাউ ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট ফর কিডন্যাপিং এ্যাণ্ড মার্ডার।

মালা ততক্ষণে একটা টুকরো পাথর তুলে নিয়ে সাধুর নাকে ছুঁড়ে মেরেছে।

সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠল—এ ক্যা হ্যায়। তুমনে হাত মাৎ লাগাও।

মালা বলল—ও আজ জেলে ঢুকলে কাল ঠিক বেরিয়ে যাবে। কিন্তু আমার দেওয়া এই স্মৃতি চিহ্নটুকু যাতে চিরকাল আঁকা থাকে সেই ব্যবস্থাই করলাম।

এরপর যন্ত্রণা কাতর কমলুকে ধরা ধরি করে জিপে ওঠানো হ'ল। তারপর ওর চিকিৎসার জন্য পুলিশের জিপ দ্রুত ওকে নিয়ে এগিয়ে চলল দেওঘরের হাসপাতালের দিকে। সঙ্গে মালা ও চন্দনও চলল।

এর দিন তিনেক পরের কথা। চারুভিলায় সেদিন দারুণ উৎসব। সেই রাধাকৃষ্ণ মূর্তি আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠার দিন আজ। বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়েছেন। আর তো কোন ভয় নেই। দলের সবাই ধরা পড়েছে। হীরুক ও ভীরুক মরেছে পুলিশের গুলিতে। কাল্লুর মৃতদেহটা নদীর চরায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। বাদ-বাকিরা সবাই লক-আপে। কমলুর কথানুসারে নন্দন পাহাড়ের পানি ট্যাঙ্কির ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রাধাকৃষ্ণ মূর্তিকে। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে কমলুই বলে গেছে ওর বাবার সঙ্গে কাল্লুর কথা কাটাকাটির সময় মূর্তিটা ও লুকিয়ে ট্যাঙ্কের মধ্যে ফেলে দেয়। সেই সূত্রেই পাওয়া গেছে মূর্তিটা।

কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেই কমলু নেই, এটা যেন দুঃস্বপ্নের মতো। এ যেন ভাবাই যায় না। তাই চারুভিলার ছাদে আলসের ধারে হাতে হাত রেখে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা মালা ও চন্দনের চোখ বেয়ে টপ টপ করে অশ্রুর ধারা মুক্তোর মতো ঝরে পড়তে লাগল। দূরের পাহাড়, সবুজ অরণ্যানী এবং মেঘ-মুক্ত আকাশ কমলুর অভাব কতখানি বোধ করবে জানি না। তবে এই দুই কিশোর কিশোরীর হৃদয়ে কমলুর স্মৃতি হয়তো বরাবরের জন্য আঁকা হয়ে থাকবে।



এই লেখকের অন্যান্য বই

পাণ্ডব গোয়েন্দা
(১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম)
ভূতের গল্প ভয়ঙ্কর
নকুড়মামা
নকুড়মামার জয়যাত্রা
বিষন্তরার বাঘ
দুরন্ত তপাই
দীঘা সৈকতে আতঙ্ক
ভাঙা দেউলের ইতিকথা
কিশোর গল্প সংকলন
অভিশপ্ত তিড়িডম